দিল্লিতে তখন মোগল বাদশাহ আওরঙ্গজেব। বাংলায় চলছে অরাজক অবস্থা। অথচ বাংলা সে সময় সোনার বাংলা। মাঠ ভরা ফসল, পুকুর আর নদীভরা মাছ। দূর দূরান্ত থেকে সোনার বাংলা দেখতে ছুটে আসে লোক, আবার সোনার বাংলা নিঃস্ব করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে লুঠেরা আর ডাকাতের দল।
ডাকাতদের মধ্যে তখন সব থেকে দুর্দান্ত ছিল ফিরিঙ্গি জলদস্যুরা, যাদের চলতি নাম হার্মাদ। এ গল্প শুরু হয়েছে যখন সবচেয়ে বড় ফিরিঙ্গি জলদস্যু ছিল সিবাস্টিয়ান গঞ্জালেস টিবাও। গঞ্জালেস আর তার ভাইয়ের নামেই লোকে তখন কেঁপে উঠত ভয়ে, এমনই নৃশংস আর নিষ্ঠুর ছিল তারা।
লুঠপাট ডাকাতি আর হিংস্রতায় ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের সঙ্গে পাল্লা দিচ্ছিল আর একটা রাজ্য—আরাকান। সেখানকার লোকদের বলা হত মগ। এই মগ ডাকাতদের সঙ্গে ফিরিঙ্গি ডাকাতদের প্রথম দিকে ছিল দারুণ বোঝাপড়া।
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নতুন উপন্যাস এমনই এক পটভূমিকায় লেখা। ইতিহাস বলে, দুর্ধর্ষ ফিরিঙ্গি জলদস্যু গঞ্জালেস আর তার দলবল নাকি শর্ত সাপেক্ষে ধরা দিয়েছিল মোগল সেনাপতি শায়েস্তা খাঁর কাছে। কিন্তু ইতিহাস বলেনি এক অকুতোভয় বাঙালী যুবকের কথা, যে তার প্রচণ্ড জেদ, সাহস আর প্রতিশোধস্পৃহা নিয়ে পাঞ্জা লড়েছিল গঞ্জালেসের ওই জলদস্যু বাহিনীর সঙ্গে।
সেই অজানা কাহিনীই শোনালেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এই উপন্যাসে।

১২·০০
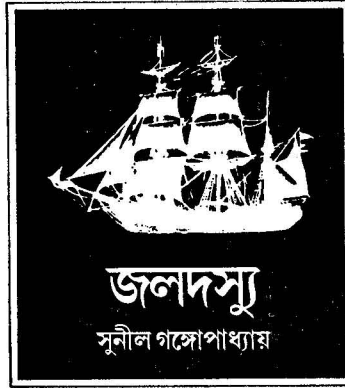
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

জন্ম: ২১ ভাদ্র ১৩৪১ (৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪)। ফরিদপুর, বাংলাদেশ।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ। টিউশনি দিয়ে কর্মজীবনের শুরু। তারপর নানা অভিজ্ঞতা।
বর্তমানে আনন্দবাজার পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত।
শখ: ভ্রমণ। দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করেছেন।
প্রথম রচনা শুরু কবিতা দিয়ে। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক।
কবি হিসেবে যখন খ্যাতির চূড়ায়, তখন একসময় উপন্যাস রচনা শুরু করেন।
প্রথম উপন্যাস: 'আত্মপ্রকাশ'। শারদীয়া 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত।
প্রথম কাব্যগ্রন্থ: 'একা এবং কয়েকজন'। ঠিক এই নামেই তিনি পরে একটি উপন্যাস লিখেছেন।
ছোটদের মহলেও সমান জনপ্রিয়তা। প্রথম কিশোর উপন্যাস—'ভয়ঙ্কর সুন্দর'। ছদ্মনাম 'নীললোহিত'। আরও দুটি ছদ্মনাম—'সনাতন পাঠক' এবং 'নীল উপাধ্যায়'।

অলংকরণ: প্রণবেশ মাইতি
প্রচ্ছদ: বিপুল গুহ

॥ ১ ॥

বিকেল শেষ হয়ে গেছে, এখনো সন্ধে নামেনি। বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত কাজলা-দিঘিতে নেমে কানের ফুটো দুটো আঙুল দিয়ে চেপে পর পর কয়েকটা ডুব দিলেন। তারপর উঠে এলেন তাড়াতাড়ি। অন্যদিন বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত সাঁতার কেটে একবার দিঘিটা এপার-ওপার করেন। কিন্তু আজ বেশ শীত, বেশিক্ষণ জলে থাকা যায় না।

ঘাটে উঠে এসে তিনি আকাশের দিকে দু'হাত জোড় করে প্রণাম জানালেন। আকাশের পশ্চিম দিকে যেন আগুন ছড়িয়ে গেছে, মহা সমারোহে অস্ত যাচ্ছেন সূর্যদেব। পাখিরা ঝাঁক বেঁধে ফিরছে, দূরের কোনো-কোনো বাড়ি থেকে ভেসে আসছে শাঁখের আওয়াজ।

বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত ভিজে কাপড়েই ঘাটের পৈঠায় বসে পৈতেটি ডান হাতে ধরে চোখ বুজে সন্ধ্যা-আহ্নিক করতে বসলেন। বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত খুব সুপুরুষ, ঘিয়ের মতন গায়ের রং, ছ' ফুটের বেশি লম্বা। দাড়ি-গোঁফ নেই, মাথার চুলও নেই, মাথার মাঝখানে শুধু এক গোছা চুলের টিকি। তাঁর বয়েস সাতাশ বছর।

আহ্নিক শেষ হবার পর বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত শুনতে পেলেন, গ্রামের একদিক থেকে কিসের যেন একটা গোলমাল শোনা যাচ্ছে। তিনি সেইদিকে তাকিয়ে কান পেতে আওয়াজটা বোঝবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু ঠিক বোঝা গেল না, কারা যেন চ্যাঁচামেচি করছে খুব। বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত ভাবলেন, আবার হয়তো একটা বাঘ ঢুকে পড়েছে গ্রামে। সুন্দরবন থেকে প্রায়ই দুটো-একটা বাঘ ছিটকে চলে আসে

এদিকে।

বাঘের কথা ভেবে বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত একটু চঞ্চল বোধ করলেন। বাঘ মারায় তাঁর খুব উৎসাহ। বামুন পণ্ডিতের ঘরের ছেলে হলেও তিনি ছেলেবেলা থেকেই কুস্তি আর লাঠি খেলায় খুব ওস্তাদ। বর্শা ছুঁড়ে হরিণ শিকার করায় তিনি ওস্তাদ। গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে দল বেঁধে তিনি দু'বার দুটি বাঘ মেরেছেন।

কিন্তু এখন তাঁর যাওয়া চলবে না। এখন তাঁর অন্য কাজ আছে।

তিনি ভিজে কাপড় বদলে একটি গরদের কাপড় পরে নিলেন। তারপর পৈতেটা চিপড়োতে লাগলেন। মাথা মোছার কোনো ব্যাপার নেই, গায়েও জল লেগে রইল। এই শীতের মধ্যেও তাঁর খালি গা। ভিজে কাপড়টা পুকুরের জলে ধুয়ে এনে তিনি মেলে দিলেন ঘাটের ওপর, দু'দিকে দু'টি গাছের ডাল চাপা দেওয়া রইল। তারপর তিনি এগোলেন মন্দিরের দিকে।

শিবমন্দিরটি গ্রামের একেবারে শেষ প্রান্তে। গ্রামের নামও শিবতলা। কয়েক পুরুষ ধরে বিশ্বেশ্বররাই এই মন্দিরের পূজারী। ছেলেবেলায় বিশ্বেশ্বরের দুরন্তপনা দেখে অনেকে ভেবেছিল, এ ছেলে বড় হয়ে নিশ্চয়ই পুরুতের কাজ করবে না। কিন্তু কয়েক বছর আগে বিশ্বেশ্বরের বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। এ গ্রামে আর একজনও ব্রাহ্মণ নেই, তাই বিশ্বেশ্বরকে বাধ্য হয়েই পুজো করার ভার নিতে হল। ঠাকুরের পুজো তো বন্ধ থাকতে পারে না। গ্রামের লোকেরা এখন তাঁকে বিশু ঠাকুর বলে ডাকে।

বিশ্বেশ্বর পণ্ডিত মন্দিরের সামনে এসে একটু অবাক হলেন। মন্দিরের দ্বার খোলা, ভিতরে প্রদীপ জ্বালা হয়নি। সেখানে কেউ

নেই।

তিনি ডাকলেন, "কুড়ানি। কুড়ানি।"

কেউ কোনো উত্তর দিল না।

তিনি গলা চড়িয়ে আরও কয়েকবার ডাকলেন কুড়ানিকে, তবু কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

এ রকম তো কখনো হয় না। কুড়ানি নামের মেয়েটি প্রতিদিন এই সময় মন্দিরের দরজা খুলে সামনেটা ধোয়া-মোছা করে, প্রদীপ জ্বালে, চন্দন ঘষে রাখে, ফুল তুলে আনে। এই মেয়েটি নদীতে ভাসতে-ভাসতে একদিন এই গ্রামের কাছে এসে লেগেছিল। বিশু ঠাকুরই তখন ওকে বাঁচান। মেয়েটি কথা বলে না। বিশু ঠাকুর ওর পরিচয় জানবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই তা জানা যায় নি। অথচ মেয়েটি বোবা নয়। বিশু ঠাকুর শুনেছেন ও একা একা কথা বলে। তখন ওর বয়েস ছিল ছ-সাত বছর, এখন দশ-এগারো। মেয়েটি কারুর বাড়িতে থাকতে চায় না। গ্রামের কয়েকজন গৃহস্থ ওকে আশ্রয় দিতে চেয়েছিল, কিন্তু ও বাড়ি থেকে পালিয়ে এসে দিঘির পাড়ে একলা বসে-বসে অদ্ভুত শব্দ করে কাঁদে।

লোকে ওর নাম দিয়েছে কুড়ানি। এই মন্দিরের কাছেই ও এখন থাকে, পুজোর প্রসাদ খায়।

বিশ্বেশ্বর মন্দিরের এদিক-ওদিক ঘুরে কুড়ানির নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। হঠাৎ যেন একটু দূরের একটা ঝোপ থেকে গোঙানির শব্দ ভেসে এল।

মন্দিরটি বহু দিনের পুরনো, চারপাশে অনেক আগাছার জঙ্গল। কাছাকাছি কোনো বাড়িঘর নেই। অন্ধকার হয়ে এসেছে, দূরের

কিছু দেখা যায় না। বিশ্বেশ্বরের মনে হল, শব্দটা আসছে শিউলি গাছগুলোর কাছ থেকে। এক সময় ওখানে একটা বাগান ছিল বোধহয়, এখন সবই জঙ্গল। তার মধ্যে কয়েকটি শিউলি আর স্থলপদ্ম আর একটি লঙ্কা-জবার গাছ এখনো রয়ে গেছে।

বিশ্বেশ্বর চট করে মন্দিরের মধ্যে ঢুকে চকমকি পাথর ঠুকে প্রদীপ জ্বালালেন। তারপর সেই প্রদীপটি নিয়ে চলে এলেন শিউলি গাছগুলোর দিকে।

সেখানে এসে প্রদীপের কাঁপা-কাঁপা আলোয় দেখলেন মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে কুড়ানি। বেতের ডালিতে সে ফুল তুলেছিল, সেই ফুল তার মাথার কাছে ছড়ানো। বিশ্বেশ্বরের প্রথমেই মনে হল, কুড়ানি মরে গেছে। তিনি অস্ফুট স্বরে বললেন, হায় হতভাগী!

তিনি হাঁটু গেড়ে বসে কুড়ানির একটা হাত তুলে নিলেন। এখনো গরম আছে। নাকের কাছে হাত নিয়ে দেখলেন, একটু-একটু নিশ্বাস পড়ছে। তারপরই তিনি আর একটা বড় নিশ্বাস শুনলেন। কে যেন পাশ থেকে ফোঁস করে উঠল।

বিশ্বেশ্বর চট করে প্রদীপটা তুলেই দেখলেন, কুড়ানির পায়ের কাছেই একটা বেশ বড় গোখরো সাপ পড়ে আছে। তৎক্ষণাৎ বিশ্বেশ্বর ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। কুড়ানিকে কামড়ে বিষ ঢালার পর নিস্তেজ হয়ে এসেছে সাপটাও। বিশ্বেশ্বরকে দেখে একবার ফণা তুলে ফোঁস করে আবার নেতিয়ে পড়ল।

বিশ্বেশ্বর ভাবলেন, এখনো কুড়ানিকে বাঁচাবার চেষ্টা করা যেতে পারে। কিন্তু কুড়ানিকে তুলতে গেলে যদি সাপটা আবার তাঁকে কামড়ায়? সাপকে কিছু বিশ্বাস নেই। এই ফুলগাছটার কাছে সাপটাকে তিনি আগেও দেখেছেন দু'একবার। যেখানে সুন্দর

জিনিস থাকে, সেখানেও এত ভয়ঙ্করের ঘোরাফেরা। কুড়ানি নিশ্চয়ই অন্ধকারে সাপটার গায়ে পা দিয়ে ফেলেছিল।

হাতের কাছে লাঠি নেই। অথচ দেরি করবারও উপায় নেই। বিশ্বেশ্বর দারুণ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সাপটার লেজটা ধরে ফেলেই উঠে দাঁড়িয়ে মাথার ওপর বোঁ-বোঁ করে ঘোরাতে লাগলেন। বেশ কয়েকবার ঘুরিয়ে সেটাকে ছুড়ে ফেলে দিলেন দূরে। সাপটা আর বাঁচবে না। বিশ্বেশ্বর নিজে আগে কখনো এভাবে সাপ মারেননি। কিন্তু নদীর ধারে জেলেদের দেখেছেন এইভাবে সাপ ধরে মাথার ওপর ঘোরাতে। সামান্য একটু দেরি হলেই সাপটা তাঁকে কামড়ে দিতে পারত। শীতের মধ্যেও বিশ্বেশ্বরের গায়ে ঘাম এসে গেল।

এর পর বিশ্বেশ্বর কুড়ানিকে কোলে তুলে এনে মন্দিরের পরিষ্কার চাতালে শুইয়ে দিলেন। সাপটা কতক্ষণ আগে কুড়ানিকে কামড়েছে কে জানে! তবু এক্ষুনি দড়ির বাঁধন দেওয়া দরকার। দড়ি কোথায় পাওয়া যাবে?

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দ্রুত চিন্তা করে বিশ্বেশ্বর ছুটে গেলেন দিঘির ধারে। তাঁর যে ভিজে কাপড়টা মেলে দিয়েছিলেন, সেটাই তুলে নিয়ে ছিঁড়তে লাগলেন ফালা ফালা করে।

সেই সময় গ্রামের ভেতরের গোলমালটা অনেক বেশি বেড়েছে, কারা যেন কাঁদছে, কারা দৌড়াদৌড়ি করছে। সূর্য ডুবে গেলেও পশ্চিমের আকাশ আগুনের মতন লাল।

কিন্তু সেইদিকে মন বা কান দেবার সময় নেই বিশ্বেশ্বরের। তিনি তাড়াতাড়ি ফিরে এসে বাঁধন দিতে লাগলেন কুড়ানিকে। ওর ডান পায়ে কামড়েছে সাপটা। পর পর কয়েকটা বাঁধন খুব কষে দেওয়ায় কুড়ানি একবার গোঙানি দিয়ে উঠল। এই সময় কুড়ানিকে জাগিয়ে

রাখা দরকার বলে তিনি চাপড় মরতে লাগলেন কুড়ানির গালে।

কয়েকজন লোক হুদ্দাড় করে ছুটে এল মন্দিরের সামনে। অসম্ভব ভয় পাওয়া গলায় তারা চিৎকার করে উঠল, "বিশু ঠাকুর, পালাও! পালাও! হার্মাদ এসেছে!"

তারা আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না; হুড়মুড় করে ছুটে গেল জঙ্গলের দিকে।

হার্মাদ শুনে বিষম চমকে উঠলেন বিশ্বেশ্বর। হার্মাদের কথা তিনি শুনেছেন, সবাই শুনেছে, কিন্তু এদিকে তো কখনো হার্মাদ আসেনি। এই হার্মাদ জলদস্যুরা অসম্ভব নিষ্ঠুর, অসম্ভব হিংস্র, সামান্যতম দয়ামায়াও এদের নেই। এরা মা-বাবার সামনে সন্তানকে এক কোপে কেটে ফেলতে পারে। তার পরও আবার হা-হা করে হাসে।

আরও কিছু লোক ছুটে এল এদিকে, তারাও ঐ এক কথা বলল, "পালাও! পালাও! বিশু ঠাকুর, পালাও।"

প্রাণ বাঁচাতে গেলে বিশ্বেশ্বরের এখন পালানোই দরকার। কিন্তু কুড়ানিকে নিয়ে কী করবেন? কুড়ানি এখনো বেঁচে আছে, তাকে কি এই অবস্থায় ফেলে চলে যাওয়া যায়? এক্ষুনি কুড়ানির ক্ষতস্থানটা চিরে দিয়ে আগুনে সেখানটা পোড়ানো দরকার, নইলে কুড়ানি বাঁচবে না। কুড়ানিকে ফেলে দিয়েই বা তিনি কতদূর পালাতে পারবেন?

বিশ্বেশ্বর কুড়ানিকে পাঁজাকোলা করে তুলে মন্দিরের মধ্যে নিয়ে এলেন, তারপর দরজা বন্ধ করে দিলেন। হার্মাদ আসুক বা যে-ই আসুক, একজনের প্রাণ বাঁচানোই এখন সবচেয়ে বড় কাজ। ঠাকুরের পুজোরও দেরি হয়ে যাচ্ছে। তা দেরি হোক, তার থেকেও বড় কুড়ানিকে বাঁচিয়ে তোলা।

তিনি ফলমূল কাটার ছোট ছুরিটা দিয়ে চিরে দিলেন কুড়ানির পায়ের ক্ষতটা। তারপর প্রদীপের আগুনে আর-একটা সলতে ধরিয়ে নিয়ে সেটা দিয়ে ছেঁকা দিতে লাগলেন সেই ক্ষতস্থানে। এরকম কয়েকবার করার পর কুড়ানি একবার যন্ত্রণায় গুমরে উঠল। তাতে আশা হল বিশ্বেশ্বরের। তিনি কুড়ানির কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলতে লাগলেন, "এই কুড়ানি! কুড়ানি! আর ভয় নেই! ওঠ্! চোখ মেলে ত্যাখ!"

সাপে-কাটা মানুষ ঘুমিয়ে পড়লে বা অজ্ঞান হয়ে গেলে তাদের শরীরে বিষ আরও ছড়িয়ে যায়। সেইজন্য বিশ্বেশ্বর খুব চেষ্টা করতে লাগলেন ওকে জাগিয়ে তোলার।

এইভাবে কিছু সময় কাটল। মাঝে-মাঝে বিশ্বেশ্বর বাইরে কিছু লোকের ছোটাছুটির আওয়াজ পেলেন। কিন্তু বিশ্বেশ্বর কুড়ানিকে নিয়েই ব্যস্ত।

একসময় দুমদাম করে মন্দিরের দরজায় ধাক্কা পড়ল, বিশ্বেশ্বর ভাবলেন, নিশ্চয়ই গ্রামবাসীরা কেউ কেউ এই মন্দিরে আশ্রয় নিতে চাইছে। হার্মাদরা লুটপাট করতে আসে, এই পুরনো ভাঙা শিবমন্দিরে তারা কিছুই পাবে না। ফিরিঙ্গি হলেও হার্মাদরা জানে কোন্ মন্দিরে কী পাওয়া যায়।

বিশ্বেশ্বর হেঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "কে?"

বাইরে থেকে কিছু দুর্বোধ চিৎকার ভেসে এল।

বিশ্বেশ্বর বললেন, "দরজা খোলা হবে না! এখানে কেউ আসতে পারবে না!"

এবার দরজায় আরও জোরে ধাক্কা পড়ল। মনে হয়, কারা যেন বাইরে থেকে দরজাটা ভেঙে ফেলতে চাইছে।

মন্দিরের মধ্যে আর লুকোবার জায়গা নেই, অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে যাবারও পথ নেই। শিবলিঙ্গের পিছনে একটা ত্রিশূল গোঁজা আছে, বিশ্বেশ্বর এক টানে তুলে নিলেন সেটা। বামুন পণ্ডিত হলেও তিনি সাহসী সবল পুরুষ, লড়াই না দিয়ে মন্দিরের অধিকার ছাড়বেন না।

পুরনো দরজা, মড়মড়াত করে সেটা ভেঙে পড়ল একটুক্ষণের মধ্যেই। বিশ্বেশ্বর ত্রিশূল উঁচিয়ে বললেন, "সাবধান!"

কিন্তু একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বেশ্বর তাড়াতাড়ি ত্রিশূলটা ফেলে দিলেন পায়ের কাছে।

তিনি দেখলেন প্রায় কুড়ি-পঁচিশজন ফিরিঙ্গি দস্যু দাউ দাউ করে জ্বলা মশাল হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে। একেবারে সামনে যে, সে-ই নিশ্চয়ই ওদের দলপতি, সে প্রায় তিনজন মানুষের সমান মোটা আর তেমনি লম্বা। মুখ-ভর্তি লালচে রঙের দাড়ি, মাথায় একট মস্ত গোল টুপি, গায়ে একটা চামড়ার কোট। দস্যুদের সকলের হাতে খোলা তলোয়ার, শুধু ওদের দলপতির হাতে লম্বা পিস্তল। সেই পিস্তল সে তাক করেছিল বিশ্বেশ্বরকে মারবার জন্য।

এদের সঙ্গে লড়াই করে কোনো লাভ নেই বুঝেই বিশ্বেশ্বর ত্রিশূলটা তাড়াতাড়ি ফেলে দিয়ে হাত জোড় করে দাঁড়ালেন। কয়েকজন দস্যু ঢুকে এল মন্দিরের মধ্যে, ওদের সর্দার বিশ্বেশ্বরের গালে এক চড় মেরে বলল, "দরজা বন্ধ রেখেছিলি কেন রে কুক্কুরীর বাচ্চা?"

দস্যুসর্দারের হাতের এমনই জোর যে, সেই চড়ের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বেশ্বরের ফর্সা মুখে পাঁচটা আঙুলের লাল দাগ দেখা দিল। রাগে অপমানে বিশ্বেশ্বরের সারা শরীর জ্বলে গেল। অথচ এখন রাগ

দেখিয়েও কোনো লাভ নেই। তিনি বিনীতভাবে বললেন, "সাহেব, আমি একজন পুরুত বামুন, এই মন্দিরে কিছুই নেই—"

'চোপ' বলে দস্যুসর্দার পিস্তলের বাট দিয়ে সজোরে মারল বিশ্বেশ্বরের নাকে। সঙ্গে সঙ্গে দরদর করে রক্ত পড়তে লাগল। বিশ্বেশ্বর চুপ করে গেলেন। এরা অকারণে নিষ্ঠুরতা দেখাতে ভালবাসে। বিশ্বেশ্বরের দারুণ ইচ্ছে হল, ঐ দস্যুসর্দারের গালে একখানা প্রকাণ্ড চড় ও নাকে একখানা ঘুঁষি মারতে। কিন্তু তাহলে এখুনি ওরা তাঁকে খুন করবে। এত তাড়াতাড়ি মরে লাভ কী? বিশ্বেশ্বর মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, বেঁচে থাকলে ঠিক এর শোধ নেবেন।

দস্যুরা মন্দিরের মধ্যে তছনছ করতে লাগল। দামি জিনিস কিছুই নেই। শুধু রয়েছে কয়েকটা বড় বড় পেতল-কাঁসার বাসন। সেগুলোই ঝনঝন করে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল বাইরে।

মাটিতে পড়ে থাকা কুড়ানিকে দেখে দস্যুসর্দার বলল, "এটা কী?"

বিশ্বেশ্বর বললেন, "সাহেব, ও অসুস্থ!"

দস্যুসর্দার পা দিয়ে জোরে ঠেলে দিল কুড়ানিকে। কুড়ানি কয়েক পাক গড়িয়ে গেল। সর্দার মশাল নিয়ে কুড়ানির মুখের কাছে ঝুঁকে দেখে বলল, "মেয়ে! চল, একেও নিয়ে চল।"

দস্যুরা ঠেলাঠেলি করে বাইরে নিয়ে এল বিশ্বেশ্বরকে। কয়েকজন তাঁকে জাপটে ধরে হাত দু'খানা পিছমোড়া করে বাঁধল। তারপর দাঁড় করিয়ে দিল এক পাশে। বিশ্বেশ্বর দেখলেন, সেখানে আরও কুড়ি-পঁচিশজন নারী-পুরুষ, তাঁরই মতন হাত-বাঁধা, বন্দী।

দস্যুরা কুড়ানিকেও চ্যাংদোলা করে এনে একটা বাঁশের সঙ্গে হাত-পা বেঁধে দিল। তারপর সেই বাঁশটা বিশ্বেশ্বর ও আর একজন

বন্দীর কাঁধে তুলে দিয়ে বলল, "চল্, কুত্তির বাচ্চারা সব চল এবার !"

সার বেঁধে বন্দীদের হাঁটিয়ে নিয়ে চলল দস্যুরা। এই অবস্থাতেও বিশ্বেশ্বর অবাক হয়ে ভাবলেন, দস্যুরা তাঁদের নিয়ে চলেছে কোথায় ? দস্যুরা সাধারণত লুটপাট করেই চলে যায়, কয়েকজনকে খুনও করে, কিন্তু এক সঙ্গে এত লোককে ধরে নিয়ে গিয়ে তাদের কী লাভ ?

কয়েক পা যাবার পর পেছনের বন্দীটি বলল "বিশু ঠাকুর, তুমিও পালাতে পারলে না ?"

বিশ্বেশ্বর চমকে মুখ ঘোরালেন। পিছনের বন্দীটির সারা মুখ রক্তাক্ত, বুকের ওপর আড়াআড়ি তলোয়ারের কোপ পড়েছে মনে হয়। মুখ দেখে চেনা যায় না, কিন্তু গলার আওয়াজে চিনলেন। এর সঙ্গে ছেলেবেলায় অনেক খেলা করেছেন বিশ্বেশ্বর। এ-গ্রামের সবচেয়ে জোয়ান, ও খালি হাতে একবার একটা বুনো শুয়োর মেরেছিল।

বিশ্বেশ্বর বললেন, "নিতাই, তোর এই অবস্থা !"

নিতাই বলল, "ঠাকুর, আমার ডান কাঁধে বড় ব্যথা। সে কাঁধেই বাঁশটা চাপিয়েছে। একটু দাঁড়াও, কাঁধটা বদলে নিই !"

বিশ্বেশ্বর দাঁড়িয়ে পড়লেন। দু'জনেরই হাত বাঁধা, বাঁশটা সরাবেন কী করে ? নিতাই চেষ্টা করল, বাঁশটাকে কামড়ে ধরবার। অমানুষিক শক্তিতে সে কোনোক্রমে বাঁশটাকে দাঁতে চেপে সেই অবস্থাতেই বাঁশটাকে নিয়ে এল বাঁ কাঁধে। এর মধ্যে আবার পেছনের লোক ঠেলা মারছে।

যন্ত্রণায় হাঁপাতে হাঁপাতে নিতাই বলল, "ঠিক আছে, চলো

ঠাকুর।”

বিশ্বেশ্বর জিজ্ঞেস করলেন, “আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, জানিস?”

নিতাই বলল, “তাও জানো না? আমাদের বিক্রি করবে। তুমি বামুন, শেষ পর্যন্ত তুমিও ক্রীতদাস হবে! এর চেয়ে তুমি মরে গেলে না কেন?”

এই সময় একজন দস্যু তাদের দু'জনের পিঠে চাবুক কষিয়ে বললো, “চোপ্, কোনো কথা নয়!”

॥ ২ ॥

যে সময়কার কথা বলছি, তখন দিল্লিতে রাজত্ব করছেন মোগল বাদশাহ আওরঙ্গজেব। বাংলার তখন খুবই অরাজক অবস্থা। শাসন করবার কেউ নেই। অথচ বাংলা তখন সোনার বাংলা, মাঠে-মাঠে সোনার ফসল ফলে, পুকুর-নদীগুলোয় ভরা ভাল ভাল মাছ। বাঙালী তাঁতিরা খুব সুন্দর সুন্দর কাপড় বানায়। বাংলার গরুর দুধের স্বাদ যেমন মিষ্টি, তেমনি এই দুধ থেকে তৈরিও হয় অনেক রকম চমৎকার চমৎকার মিষ্টান্ন।

দূর-দূর দেশের লোকেরা বাংলাকে একটা সোনার দেশ বলে জানে, অনেকে নিজের চোখে দেখতে আসে। আবার বাংলার ধনরত্ন, সিল্কের কাপড় ও খাবার-দাবারের লোভে ছুটে এসেছে অনেক চোর-ডাকাত। স্থলপথে তবু মাঝে-মাঝে মোগল সৈন্যের পাহারা থাকে, কিন্তু জলপথে ডাকাতদের কেউ আটকাতে পারে

না। মোগল সৈন্যরা খুব বীর ছিল বটে, কিন্তু নদী বা সমুদ্রে জাহাজ নিয়ে যুদ্ধ করার বিদ্যে তারা ভাল জানত না। আর ইওরোপ থেকে যে-সব জাতি ব্যবসা করার জন্য বাংলায় এসেছিল, তারা সবাই জাহাজি-যুদ্ধে ওস্তাদ।

ইংরেজ, ফরাসি, স্প্যানিয়ার্ড, পর্তুগীজ, ডাচ (অর্থাৎ হল্যাণ্ডের লোক, বাংলায় তাদের বলা হত ওলন্দাজ) সবাই ব্যবসা করার জন্য এদেশে এসেছে, আবার তাদের মধ্যে কিছু-কিছু লোক ডাকাতিতেও নেমেছে। এই ডাকাতরা আর কিছুদিন বাদে আলাদা জাত রইল না, মিলেমিশে এক হয়ে গেল, তখন তাদের নাম হল ফিরিঙ্গি। একদল ফিরিঙ্গি ডাকাত বোম্বাইয়ের দিক থেকে পালিয়ে বাংলায় এসেছিল বলে তাদের নাম হল বোম্বেটে। স্পেনের বিখ্যাত জাহাজ-বাহিনীর নাম ছিল আর্মাডা, সেই নামটাও কী ভাবে যেন বদলাতে-বদলাতে বাংলায় হয়ে গেল হার্মাদ। এই হার্মাদ বললেও ফিরিঙ্গি জলদস্যু বোঝায়।

আমাদের গল্পের যখন শুরু, সেই সময় সবচেয়ে বড় ফিরিঙ্গি জলদস্যুর নাম ছিল সিবাস্তিয়ান গঞ্জালেস টিবাও। এই লোকটি যেমন সাহসী, তেমনি নিষ্ঠুর। দয়ামায়া বলে কিচ্ছু নেই এর প্রাণে। তলোয়ারের এক কোপে কোনো লোকের মাথা কেটে ফেলেও এই গঞ্জালেস হো-হো করে হাসতে পারে। সোনাদানার চেয়েও রক্ত দেখলে এর কম আনন্দ হয় না। এর ভাই অ্যাণ্টনিও ডা রেগোও নিষ্ঠুরতায় প্রায় দাদারই সমান-সমান। ওদের জাহাজগুলি ঝড়ের বেগে চলে, কখন কোথায় আক্রমণ করবে ঠিক নেই। হুগলি, সুন্দরবন, ঢাকা, চট্টগ্রামের লোকেরা এই গঞ্জালেস আর তার ভাইয়ের নামে ভয়ে কাঁপে।

আমাদের এই বাংলার পাশেই আর একটা ছিল ডাকাতের দেশ। সে দেশের নাম আরাকান। এই আরাকান নামে কোনো দেশ এখন আর নেই, এখন সেটা বার্মার সঙ্গে মিশে গেছে। তখন চট্টগ্রাম জেলার পাশেই ছিল এই আরাকান রাজ্য, সেখানকার লোকদের বলা হত মগ্। লুটপাট, ডাকাতি ও হিংস্রতার জন্য এরাও ছিল খুব কুখ্যাত। এখনো কোনো জায়গায় ন্যায়বিচার না থাকলে লোকে বলে, 'মগের মুল্লুক নাকি ?'

ডাকাতে-ডাকাতে এক রকমের বোঝাপড়া থাকে। ফিরিঙ্গি বোম্বেটে আর মগ্ ডাকাতেরা নিজেদের মধ্যে জায়গা ভাগাভাগি করে নিয়েছিল। ফিরিঙ্গিদের কাছ থেকে মগরা একটা জিনিস শিখেছিল, ক্রীতদাস বিক্রি করা। বাংলা থেকে নিরীহ মানুষদের ধরে নিয়ে গিয়ে তারা তুলে দিত ফিরিঙ্গিদের হাতে, তারপর সেইসব মানুষরা চালান হয়ে যেত বিদেশে। মগদের সঙ্গে ফিরিঙ্গিদের এত ভাব হয়ে গিয়েছিল যে, আরাকানের রাজা তার বোনের বিয়ে দিয়েছিল ঐ জলদস্যু-সর্দার গঞ্জালেসের সঙ্গে। তবে যাদের স্বভাবই নিষ্ঠুর, তারা বেশিদিন অন্যদের সঙ্গে ভাব রাখতে পারে না। বন্ধুর সঙ্গেও তারা বিশ্বাসঘাতকতা করে। মগ আর ফিরিঙ্গিদের মধ্যেও সাংঘাতিক ঝগড়া শুরু হয়ে গিয়েছিল এক-সময়।

সম্রাট আওরঙ্গজেবের আরও তিন ভাই ছিল। ইতিহাসে আমরা সবাই পড়েছি যে, আওরঙ্গজেব তাঁর বাবাকে বন্দী করে এবং তিন ভাইকে মেরে-ধরে তাড়িয়ে নিজে দিল্লির বাদশাহ হয়ে বসেন। তাঁর এক ভাই সুজা আওরঙ্গজেবের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে পালিয়ে-ছিলেন এই বাংলাদেশ দিয়েই। সুজার সঙ্গে ছিলেন তাঁর স্ত্রী, তিনটি ছেলে, তিনটি মেয়ে আর প্রচুর ধনরত্ন। সম্রাট শাজাহানের পুত্র

সুজার তখন খুবই দুরবস্থা, প্রতি মুহূর্তে ধরা পড়ার ভয়। আর ধরা পড়লে কী হবে, তা তো জানা কথা। তাঁর দাদা দারা শিকোর মুণ্ডুটা কেটে আওরঙ্গজেব ভেট পাঠিয়েছিলেন শাজাহানের কাছে।

বাংলায় তখন জলদস্যুদের দোর্দণ্ড প্রতাপ, সেইজন্য সুলতান সুজা সাহায্য চাইলেন জলদস্যুদের কাছেই। বোম্বেটেরা মোগল সম্রাটের ভাইকে নিজেরা খুন করার সাহস পেল না, তবে অনেক টাকাপয়সার বিনিময়ে তাঁকে সপরিবারে একটা নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেবার প্রতিশ্রুতি দিল। নিরাপদ জায়গা মানে আরাকান, সেই মগের মুল্লুক। সেখানে মগেরা যথাসময়ে সুলতান সুজার সব সম্পত্তি লুটপাট করে এক সময় প্রাণেও মেরে ফেলবে।

ফিরিঙ্গিরা শুধু যে সুলতান সুজার কাছ থেকে কথামতন টাকাপয়সা আদায় করল তাই-ই নয়, শেষের দিকে আর লোভ সামলাতে না পেরে আরাকানের কাছাকাছি গিয়ে সুজার কয়েকটি ধনরত্নের সিন্দুকও কেড়ে নিয়ে পালিয়ে গেল।

যথাসময়ে এই খবর পৌঁছল আওরঙ্গজেবের কানে। বাংলার সাধারণ মানুষের ওপর জলদস্যুরা যে অত্যাচার করছে, সে-ব্যাপারে মোগল সম্রাট মাথা ঘামাননি। কিন্তু সুজাকে তারা ধরিয়ে না দিয়ে যে আরাকান পর্যন্ত পার করে দিয়ে এল, এজন্য তিনি ফিরিঙ্গিদের ওপর চটে রইলেন।

এর পর ঘটল আর-একটা ঘটনা।

বাংলাদেশে তখন খুচরো পয়সার কোনো প্রচলন ছিল না। ছিল বাদশাহি টাকা আর খুচরো কেনাবেচার জন্য ব্যবহার হত কড়ির। সেই জন্য এখনো আমরা বলি টাকাকড়ি। এই কড়ি অনেক পাওয়া যেত আরব্য সাগরের মালদ্বীপের কাছে সমুদ্রে। সেখান

থেকে কড়ি তুলে মোগলরা নিয়ে আসত বাংলায়।

একবার এক জাহাজ-ভর্তি কড়ি আসছিল বাংলাদেশে, এমন সময় ফিরিঙ্গিরা ঘিরে ধরল সেই জাহাজ। মোগল সৈন্যরা লড়াইয়ের চেষ্টা করল একটুক্ষণ, কিন্তু দুর্দান্ত সাহসী জলদস্যুরা তলোয়ার হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল জাহাজের মধ্যে। মোগল সৈন্যরা তলোয়ার তোলারও সময় পেল না, তার আগেই কচুকাটা হতে লাগল। জাহাজের ডেকে গড়াতে লাগল রক্তের স্রোত।

জলদস্যুরা যে-জাহাজ আক্রমণ করে, সে-জাহাজের সব লোককেই তারা মেরে ফেলে, কারুকে ছাড়ে না। সেইজন্যই প্রাণে বাঁচবার জন্য জাহাজের ক্যাপ্টেন আত্মসমর্পণ করতে চাইলেন। হাতজোড় করে তিনি দস্যুসর্দারকে বললেন, "এ-জাহাজে শুধু কড়ি আছে, এ নিয়ে তো আপনাদের কোনো লাভ নেই, এর বদলে যদি টাকা দিই তাহলে আমাদের ছেড়ে দেবেন?"

দস্যুরা ভেবে দেখল, সত্যিই অত কড়ি নিয়ে তাদের লাভ হবে না। এই কড়ি বদলে টাকা করে নিতে অনেক সময় লাগবে, দস্যুরা সবকিছুই চটপট সেরে ফেলতে চায়। তাদের দরকার সোনার টাকা, সেই টাকা তারা নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়। তারা বলল, একমাত্র স্বর্ণমুদ্রা পেলেই তারা বন্দীদের ছেড়ে দিতে পারে।

মোগল সৈন্যরা তাতেই রাজী।

কিন্তু কথা হল, টাকাটা কোথা থেকে নেওয়া হবে! জলদস্যুরা তো আর রাজধানী থেকে টাকা আনতে যাবে না। আর বিশ্বাস করে জাহাজটা ছেড়ে দেওয়াও যাবে না। অনেক আলোচনার পর ঠিক হল টাকাটা নেওয়া হবে মক্কা থেকে। মক্কায় কোনো সৈন্যসামন্ত থাকে না, সুতরাং সেখানে জলদস্যুদের ধরা পড়ার কোনো ভয় নেই।

বন্দী জাহাজখানা নিয়ে জলদস্যুরা সত্যিই চলে গেল মক্কায়। সেখানে তাদের চল্লিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হবে।

মোগল সৈন্যরা জলদস্যুদের হাতে অপমানিত হয়ে প্রতিশোধ নেবার উপায় খুঁজছিল। মক্কায় এসে তারা দেখল, সম্রাট-পরিবারের অনেক পুরুষ ও মহিলা তীর্থ করতে এসেছেন সেখানে। তাঁরা এনেছেন প্রায় আট-দশটি জাহাজ। সেই সব জাহাজে কিছু কিছু সৈন্যও আছে। এতগুলো জাহাজ দিয়ে ঘিরে ধরলে জলদস্যুরা নিশ্চয়ই কুপোকাত হবে।

দস্যু-সর্দার সিবাসস্তিয়ান গঞ্জালেস প্রথমে মোগলদের ফন্দিটা ধরতে পারেনি। হঠাৎ সে দেখল, টাকা আনবার নাম করে মোগল জাহাজের ক্যাপ্টেন আট-দশখানা জাহাজ নিয়ে আসছে তার জাহাজের দিকে। তখন সেও একটা ফন্দি করল।

গঞ্জালেস প্রথমে ভাব দেখাল যেন সে ভয় পেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। তাতে মোগলাই জাহাজগুলো খুব উৎসাহ পেয়ে তাড়া করে এল তার জাহাজ। এইভাবে গঞ্জালেস ওদের টেনে আনল গভীর সমুদ্রে। সমুদ্রের মাঝখানের লড়াইয়ে জলদস্যুরাই বেশি ওস্তাদ। মোগলাই জাহাজগুলো ঢাউস ঢাউস, সহজে এদিক ওদিক ঘুরতে পারে না। আর গঞ্জালেসের জাহাজটি ছোট হলেও সুদৃঢ়, যেমন খুশি যেদিকে ইচ্ছে যায়। গঞ্জালেসের জাহাজ ঘুরে-ঘুরে একসঙ্গে সব ক'টি মোগলাই জাহাজের ওপর কামানের গোলা বর্ষণ করতে লাগল।

মোগল জাহাজে ছোট কামান নেই। বড়গুলোর মুখ ঘোরাবার আগেই জলদস্যুদের জাহাজ চটপট সরে পড়ে। মোগলরা একটু বাদেই ভয় পেয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। গঞ্জালেস একখানা জাহাজে আগুন লাগিয়ে দিয়ে চলে গেল মক্কা ছেড়ে।

কিন্তু তার মাথার মধ্যে রাগ জ্বলছে দাউ-দাউ করে। তাছাড়া এত দূর এসেও তারা টাকা পেল না। এর শোধ নিতেই হবে।

গঞ্জালেস তার জাহাজ নিয়ে ঘাপটি মেরে বসে রইল সুরাট বন্দরের কাছাকাছি সমুদ্রে। মক্কায় তীর্থ সেরে মোগলাই জাহাজগুলো এই দিকেই ফিরবে।

কিছুদিন পর যখন জাহাজগুলো একটা একটা করে ফিরতে লাগল, তখন গঞ্জালেস ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল সেগুলোর ওপরে। সম্রাট-পরিবারের লোকজনদের কেটে টুকরো-টুকরো করে ফেলে দিল জলে। সোনাদানা সব লুঠ করে, জাহাজগুলো তছনছ করে গঞ্জালেস তার দলবল নিয়ে পালিয়ে গেল বাংলার দিকে।

এই ঘটনা শুনে আওরঙ্গজেব একেবারে রেগে আগুন হয়ে গেলেন। ফিরিঙ্গি দস্যুরা মুসলমান তীর্থযাত্রীদের ওপর অত্যাচার করেছে, তাঁর পরিবারের কয়েকজন পুরুষ ও মহিলাকে খুন করেছে। এ আর সহ্য করা যায় না।

এবার আওরঙ্গজেব ঠিক করলেন জলপথে যুদ্ধের জন্য মোগল বাহিনীকে তৈরি করতেই হবে। অবিলম্বে তৈরি হল অনেকগুলি যুদ্ধজাহাজ। তার কয়েকটি জাহাজ সঙ্গে দিয়ে তিনি তাঁর এক সেনাপতি শায়েস্তা খাঁ-কে পাঠিয়ে দিলেন বাংলার জলদস্যুদের দমন করবার জন্য।

শায়েস্তা খাঁ খুব জবরদস্ত সেনাপতি। তিনি ফিরিঙ্গি বোম্বেটে আর মগ দস্যুদের একেবারে ঠাণ্ডা করে দেবার প্রতিজ্ঞা নিয়ে আসতে লাগলেন বাংলার দিকে।

॥ ৩ ॥

বন্দীদের চাবুক মারতে মারতে জলদস্যুরা নিয়ে এল নদীর ধারে। নদীর নাম ঠাকুরানী, বর্ষাকালে এত জল থাকে যে এপার-ওপার দেখা যায় না। এই নদী দিয়েই চলে যাওয়া যায় সমুদ্রে। এখন শীতকাল, খুব বেশি জল নেই, কিন্তু যখন জোয়ার আসে তখন নদী ভরে যায়।

বিশু ঠাকুর দেখলেন, সেখানে প্রায় দেড়শো জন বন্দীকে নিয়ে এসেছে জলদস্যুরা। গ্রামের বুড়োবুড়ি আর খুব ছোট ছেলেমেয়েদের বাদ দিয়ে আর সবাইকে ধরে এনেছে। গ্রামের অনেক বাড়ি এখনো পুড়ছে আগুনে। দূরে শোনা যাচ্ছে কান্নার আওয়াজ। বিশু ঠাকুরের বাড়িতে তাঁর বুড়ি মা ছাড়া আর কেউ নেই। হয়তো তিনিও কাঁদছেন। কিংবা তাঁকে দস্যুরা মেরে ফেলেছে কি না, তাই বা কে জানে!

দস্যুরা মাত্র কুড়ি-বাইশ জন। মাত্র এই ক'জন লোক একটা গোটা গ্রাম ছারখার করে দিল। অথচ গ্রামে তো জোয়ান ছেলে কম নেই। কিন্তু দস্যুদের সঙ্গে আছে সাজ্ঘাতিক সব অস্ত্র-শস্ত্র আর গ্রামের মানুষের কাছে লাঠি আর বর্শা ছাড়া আর কিছু থাকে না। তা ছাড়া শিবতল্লা নামের এই নিরিবিলি শান্ত গ্রামের লোকেরা কখনো ভাবেইনি যে, তাদের গ্রামে কোনোদিন ফিরিঙ্গি ডাকাত আসবে। এ-গ্রামে জমিদার নেই বা তেমন কোনো বড়লোকও নেই, সাধারণ নিরীহ সব চাষী আর জেলে। কোথায়

গেলে বেশি টাকা-পয়সা পাওয়া যাবে, ডাকাতরা আগে থেকে সে-খবর জেনেই লুঠপাট করতে আসে!

কিন্তু কিছুদিন ধরে ফিরিঙ্গি দস্যুরা একটা নতুন ব্যবসা শুরু করেছে। লুঠপাটের চেয়েও তাতে বেশি লাভ। তারা এখন মানুষ ধরে নিয়ে গিয়ে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে। সাধারণ নিরীহ গ্রামের মানুষদের ধরে নিয়ে যাওয়াই বেশি সুবিধে।

এখন ভাঁটার সময়। নদীর পারে থকথক করছে কাদা। দস্যুদের জাহাজটা বেশ খানিকটা দূরে। বন্দীরা সার বেঁধে সেই কাদার মধ্য দিয়ে এগোতে লাগল জাহাজটার দিকে। এখানকার কাদা একেবারে আঠার মতন, পা টেনে ধরে। কেউ-কেউ হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতে লাগল। হাত পেছন দিকে বাঁধা বলে পড়ে গেলে সহজে ওঠা যায় না, সারা গায়ে কাদা মাখামাখি হয়ে যায়। তখন দস্যুরা এসে ঘাড় ধরে টেনে তোলে আর পিঠে চাবুক কষায়। যার পিঠে চাবুক পড়ে সে অমনি কেঁদে ওঠে।

বিশু ঠাকুর বললেন, "নিতাই, সাবধান! দেখিস, যেন পা পিছলে না যায়।"

নিতাই বলল, "আমি ঠিক আছি, ঠাকুর।"

নিতাই কিংবা বিশু ঠাকুর পড়ে গেলে তাদের কাঁধে ঝোলানো বাঁশে বাঁধা কুড়ানিও পড়ে যাবে। কুড়ানি অজ্ঞান, কাদা লেগে যাবে তার চোখে-মুখে। এমনিতে মেয়েটা এখনো বেঁচে আছে কি না কে জানে।

নিতাই আবার জিজ্ঞেস করল, "মেয়েটার এ অবস্থা হল কী করে?"

বিশু ঠাকুর বললেন, "ওকে সাপে কামড়েছে!"

নিতাই তেতো গলায় বলল, "সাপের কামড়েও মরল না, আবাগির বেটি! বেঁচে থেকে কী হবে, জাত-মান সব খোয়াবে।"

বিশু ঠাকুর বললেন, "ও কথা বলতে নেই। যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। মরে গেলে তো সব ফুরিয়েই গেল!"

অতি সাবধানে ওরা এসে পৌঁছল জাহাজের কাছে।

জাহাজের পেটের কাছে খানিকটা জায়গা খুলে দেওয়া হয়েছে। সেখান দিয়ে ওরা ঢুকে গেল জাহাজের খোলের মধ্যে। ভেতরটা একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। সেখানে গিয়ে আর কেউ তাল সামলাতে পারল না, এ ওর ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। কুড়ানি কোথায় ছিটকে চলে গেল, বিশু ঠাকুর নিজেও পড়লেন হুমড়ি খেয়ে। সব মিলিয়ে যেন একটা মানুষের তাল। প্রায় সবাই ভয়ে চিৎকার করছে। বিশু ঠাকুরের মনে হল, নরক জায়গাটা বুঝি এরকমই হয়। জীবন্ত অবস্থায় তিনি নরকে চলে এসেছেন।

একটু পরে দেখা গেল মশালের আলো। ওপরের ডেক থেকে সিঁড়ি বেয়ে এক হাতে মশাল, আর-এক হাতে চাবুক নিয়ে নেমে এল চার-পাঁচজন প্রহরী। শূন্যে চাবুকের সপাসপ শব্দ করে তারা বলতে লাগল, "এই, সব সিধা হও! খাড়া হও! এই কুত্তার বাচ্চারা, ওঠ্!"

তারা নিজেরাই সেই মানুষের তালের ওপর থেকে কয়েক-জনের ঘাড় ধরে টেনে টেনে তুলল। তারপর অন্যরা অনেকে নিজে থেকেই উঠে দাঁড়াতে পারল। সকলের সারা গায়ে কাদা মাখা। মেয়েরা ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কেউ কেউ বৃথা জেনেও অনুনয় করে বলছে, "ওগো, তোমাদের পায়ে পড়ি, আমাদের ছেড়ে দাও! বাড়িতে আমার ছোট ছেলে আছে! ওগো, পায়ে পড়ি!"

প্রহরীরা হুকুম দিল, “মাঝখান খালি করো! সব দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াও! মাথা গুনতি হবে।”

হুকুম দেবার সঙ্গে সঙ্গে তারা এলোপাথাড়ি চাবুক চালায়। তাতেই কাজ হয় সঙ্গে সঙ্গে। সবাই হুড়োহুড়ি করে সরে গিয়ে চারদিকের দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ায়। মাঝখানটা ফাঁকা হয়ে যায়।

বিশু ঠাকুর দেখলেন সেই ফাঁকা জায়গাটায় পড়ে আছে কুড়ানি। তাঁর যেন মনে হল, কুড়ানি নড়ে উঠল একবার।

একজন প্রহরী ওর কাছে এসে বলল, “এটার আবার কী হল? মরে গেছে?”

অন্য একজন পা দিয়ে তাকে উল্টে দিয়ে বলল, “এঃ, এর মুখ দিয়ে ফেনা বেরিয়ে গেছে, একে দিয়ে আর কোনো কাজ হবে না।”

প্রথম জন বলল, “এটাকে জলে ফেলে দে। শুধু-শুধু এখানে রাখলে গন্ধ হবে।”

বিশু ঠাকুর চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, “না! ও বেঁচে আছে।”

একজন প্রহরী বলল, “চোপ্! কোনো কথা নয়। শোন্ কুত্তার বাচ্চারা, কাপ্তান সাহাব সিবাস্তিয়ান গঞ্জালেস টিবাওয়ের হুকুম, কেউ কোনো কথা বলতে পারবে না। এখানে কোনো গোলমাল চলবে না। কেউ কথা বললেই দশ ঘা চাবুক! মনে থাকে যেন।”

যে-বাঁশটায় কুড়ানি বাঁধা, দু'জন প্রহরী সেই বাঁশটা তুলে ধরল, আর একজন বলল, “ওকে জলে ছুঁড়ে ফেলে দে!”

বিশু ঠাকুর বললেন, “না, ওকে ফেলবেন না! আমি ওকে বাঁচিয়ে তুলতে পারি, ওকে একটু জল খাওয়াতে হবে।”

একজন প্রহরী গর্জে উঠল, "কে কথা বলল? কোন্ কুত্তার বাচ্চা?"

বিশু ঠাকুর এক পা এগিয়ে এসে বললেন, "আমি। ভাল করে দেখে নাও, আমি কুত্তার বাচ্চা নই।"

প্রহরীদের মধ্যে যে সর্দার গোছের, সে নিষ্ঠুরের মত হাসল। তারপর অন্যদের বলল, "তোরা এই মুর্দাটাকে ফেলে দে, আমি এর ব্যবস্থা করছি।"

বিশু ঠাকুর "না" বলে ছুটে এলেন এবং যে-প্রহরী দুজন কুড়ানিকে নিয়ে যাচ্ছিল, তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর হাত বাঁধা বলে তিনি ওদের ধরতে পারলেন না, কিন্তু মাথা দিয়ে ঢুঁ মারলেন একজনের পেটে। তিনজনেই পড়ে গেল এক সঙ্গে। এই সময় কুড়ানি একটু জ্ঞান ফিরে পেয়ে আস্তে আস্তে বলে উঠল, "মা, মাগো!"

এই অবস্থাতেও বিশু ঠাকুর একটু অবাক হলেন। এতদিন পরে কুড়ানির মুখে কথা ফুটেছে!

বিশু ঠাকুর উঠতে পারলেন না, কিন্তু প্রহরীরা চট করে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর পাঁচজন প্রহরী একসঙ্গে চাবুক চালাতে লাগল তাঁর ওপর। বিশু ঠাকুর মুখ দিয়ে একটাও শব্দ করলেন না, কিন্তু তাঁর শরীরটা কুঁকড়ে-কুঁকড়ে উঠতে লাগল।

একটু পরেই তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন।

বিশু ঠাকুর কতক্ষণ বা কতদিন অজ্ঞান হয়ে ছিলেন, তা তিনি জানেন না। একবার চোখ মেলে মনে হল, সব দিকে অন্ধকার, আর কোনো মানুষজন নেই। তাঁর সারা গায়ে অসহ্য ব্যথা। তিনি আবার চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়লেন।

অনেকক্ষণ বাদে আবার চোখ মেলতে গিয়ে দেখলেন ভীষণ আলো, তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে, তিনি তাকাতে পারছেন না। তার চেয়ে ঘুমিয়ে পড়াই ভাল। ঘুমিয়ে পড়লেন আবার।

তারপর এক সময় মনে হল, তিনি ছেলেবেলায় ফিরে গেছেন, তাঁর বয়েস সাত কিংবা আট। তিনি শুয়ে আছেন মায়ের কোলে, মা হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন তাঁর মাথায়।

চোখ মেলে দেখলেন, মায়ের কোলে নয়, তিনি শুয়ে আছেন সেই জাহাজেরই খোলে, তবে কে যেন সত্যিই হাত বুলিয়ে দিচ্ছে তাঁর মাথায়।

তিনি উঠে বসতে গেলেন, অমনি নিতাই ফিসফিস করে বলল, "ঠাকুর, উঠো না, উঠো না!"

বিশু ঠাকুরের সারা গায়ে চাবুকের দাগ। চামড়ার চাবুক তাঁর শরীরে কেটে-কেটে বসেছে। তিনি একটা চোখ খুলতে পারছেন না, অন্য চোখটি দিয়ে দেখলেন, সব বন্দীরা দেয়ালে হেলান দিয়ে নিঃস্পন্দ হয়ে বসে আছে। হঠাৎ মনে হয়, তাদের একজনও বেঁচে নেই। এখন মনে হয় দিনের বেলা, কারণ কোনো মশাল জ্বলছে না। জাহাজটা মাঝে-মাঝে দুলে উঠছে, তার মানে চলন্ত।

হঠাৎ একটা কথা তাঁর মনে ঝলক দিয়ে উঠল। নিতাই তাঁর মাথায় হাত বুলোচ্ছিল কী করে?

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "নিতাই, তোর হাত খোলা?"

নিতাই বলল, "হ্যাঁ, ঠাকুর, আমাদের সকলেরই হাত খুলে পাগুলো শেকলে বেঁধে দিয়েছে।"

বিশু ঠাকুর নিজের পায়ে হাত দিলেন। তাঁর পা শিকলে বাঁধা নেই।

নিতাই বলল, "তুমি অজ্ঞান হয়ে ছিলে তো, তাই তোমায় বাঁধেনি। একটু পরে এসেই বাঁধবে। বাবাঃ, যা ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলে! অমন গোঁয়ারের মতন ডাকাতগুলোর দিকে তেড়ে গেলে, ওরা তো তোমায় খুনই করে ফেলত!"

"আমি কতক্ষণ অজ্ঞান হয়ে ছিলাম রে?"

"তা ঠিক বলতে পারি না। একদিন একরাত তো হবেই!"

"কুড়ানিকে ওরা জলে ফেলে দিয়েছে শেষ পর্যন্ত?"

"কী জানি! ওপরে তো নিয়ে গেল দেখলাম!"

"কুড়ানি বেঁচে ছিল তখনও। একটা জ্যান্ত মেয়েকে ওরা জলে ফেলে দেবে?"

"ঠাকুর, এদের কি মায়া-দয়া আছে? বাঘ-সিংহেরও মায়া-দয়া থাকতে পারে, কিন্তু বোম্বেটেদের কাছ থেকে তা আশা করা যায় না।"

"বোম্বেটেরাও তো মানুষ। তাদের কি মন বলে কিছু নেই?"

"তা জানি না। কিন্তু ওরা আমাদের মানুষ বলে মনে করে না। দেখছ না, গোরু-ছাগলের মতন ওরা আমাদের বিক্রি করার জন্য নিয়ে যাচ্ছে!"

বিশু ঠাকুর কিছুক্ষণ চুপ করে চিন্তা করতে লাগলেন। কুড়ানিকে যদি ঠিক ঐ সন্ধের সময় সাপে না কামড়াত, তা হলে তিনি অনায়াসে পালিয়ে যেতে পারতেন। তাদের গ্রামের পেছন দিকে একটা জলা আছে, সেখানে এমন ঘন নলখাগড়ার ঝোপ যে, কেউ লুকোলে খুঁজে বার করা অসম্ভব। কিন্তু কুড়ানির জন্য তিনিও পালাতে পারলেন না, আর কুড়ানিকেও শেষ পর্যন্ত বাঁচানো গেল না।

বিশু ঠাকুরের বুক ঠেলে বিরাট এক দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

একটু পরে নিতাই আবার বলল, "ঠাকুর, তুমি খাবে না? দেখো, তোমার সামনে দু'খানা রুটি আর একদলা গুড় পড়ে আছে। আমাদের দু'বেলা ঐ খেতে দেয়!"

বিশু ঠাকুর ঘেন্নার সঙ্গে বললেন, "ঐ ম্লেচ্ছের হাতের খাবার আমি খাব? থুঃ!"

নিতাই বলল, "কিন্তু ঠাকুর, এর পর আমরা কোথায় কার হাতে পড়ব, তার কি কিছু ঠিক আছে? বেঁচে থাকতে গেলে খেতে তো হবেই।"

"দু'খানা রুটিতে তোর কী করে পেট ভরবে? আমার খাবার তুই খেয়ে নে!"

"না, না, তা কখনো হয়! তুমি দু'দিন কিছু খাওনি, একটু গুড় অন্তত মুখে দাও! গুড় খেলে দোষ নেই!"

বিশু ঠাকুর সে-কথার উত্তর না দিয়ে অতিকষ্টে উঠে দাঁড়ালেন। সারা শরীরে অসহ্য ব্যথা, দুর্বলতার জন্য মাথা ঘুরছে। এক্ষুনি বুঝি টলে পড়ে যাবেন। দাঁতে দাঁত চেপে তিনি মনের জোরে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর এক পা এক পা করে এগোলেন সিঁড়ির দিকে।

বন্দীরা কেউ কোনো কথা বলছে না। ড্যাব ড্যাব করে অবাক চোখ মেলে দেখছে তাঁকে। কথা বলার জন্য কেউ-কেউ নিশ্চয়ই এর মধ্যে চাবুক খেয়েছে কয়েকবার।

এই সময় ওপরের ডেকে পায়ের শব্দ হল, কারা যেন এল সিঁড়ির দিকে।

বিশু ঠাকুর দৌড়ে ফিরে এলেন নিজের জায়গায়, আবার অজ্ঞানের ভান করে চোখ বুজে রইলেন।

দু'জন প্রহরী নেমে এল সিঁড়ি দিয়ে। একজনের হাতে গনগনে আগুন ভর্তি একটি মাটির মালসা, আর একজনের হাতে একটা লোহার পাঞ্জা। তারা ঐ পাঞ্জা পুড়িয়ে প্রত্যেক বন্দীর বাহুতে ছাপ দিয়ে দেবে। ঐ ছাপ হচ্ছে ক্রীতদাসদের চিহ্ন।

প্রহরীরা এক-একজন বন্দীর গায়ে সেই গরম পাঞ্জার ছাপ দিতে লাগল, আর সে চেঁচিয়ে উঠতে লাগল যন্ত্রণায়। সমস্ত জায়গাটা বিকট চ্যাঁচামেচি আর কান্নায় ভরে গেল।

বিশু ঠাকুর নিজের ঠোঁট কামড়ে রইলেন, একটু পরেই ওরা এসে যাবে তাঁর কাছে। চাবুকের ঘা সহ্য করা যায়, কিন্তু গায়ে গরম লোহার ছেঁকা দিলে শরীর কেঁপে উঠবেই, মুখ দিয়েও শব্দ বেরিয়ে যেতে পারে। তাঁর যে জ্ঞান ফিরেছে, তা প্রহরীরা বুঝে ফেলবে। এবার তারা শেকল বেঁধে দেবে তাঁর পায়ে। তার কোনো মুক্তির উপায় থাকবে না। তিনি শিবের পূজারী, তিনি হবেন ফিরিঙ্গির ক্রীতদাস?

এই চিন্তাতেই তাঁর গায়ে যেন অসুরের শক্তি এল। তিনি চোখ মেলে দেখলেন চারপাশ। প্রহরী দু'জন তাঁর খুব কাছে এসে গেছে, এর পরই তারা নিতাইকে ছাপ দেবে।

যে প্রহরীটির হাতে আগুনের মালসা সে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল। বিশু ঠাকুর লাফিয়ে উঠে তার হাতে কষালেন এক লাথি। মালসাটা ছিটকে গিয়ে চারদিকে ঝরে পড়তে লাগল জ্বলন্ত কাঠকয়লা। প্রহরীটা ভয় পেয়ে 'হোলি মেরি, হোলি যীশাস' বলে চেঁচিয়ে মাথা বাঁচাবার জন্য দু' হাতে মাথা চাপা দিল। অন্য প্রহরীটি গরম পাঞ্জাটা তুলে বিশু ঠাকুরকে মারতে আসতেই তিনি নিচু হয়ে দমাস করে এক ঘুঁষি কষালেন তার বুকে। প্রহরীটির

গায়েও দারুণ জোর, সেই ঘুঁষি খেয়েও সে টলল না, গোরিলার মতন দু' হাত বাড়িয়ে সে বিশু ঠাকুরকে জাপটে ধরতে এল। অন্য প্রহরীটিও ততক্ষণে সামলে নিয়ে কোমরের খাপ থেকে তলোয়ার টেনে বার করার চেষ্টা করছে।

বিশু ঠাকুর দু'জনকেই কোনোরকমে এড়িয়ে ছুটে গেলেন সিঁড়ির দিকে। তাঁকে বাঁচতেই হবে, বাঁচতেই হবে। আর বাঁচার একমাত্র উপায় জলে ঝাঁপিয়ে পড়া।

প্রহরী দুটো তাঁকে তেড়ে আসার আগেই তিনি উঠে গেলেন সিঁড়ির ওপরে। সেখানে দেখলেন একটা চাবুক পড়ে আছে। সেটা মুহূর্তের মধ্যে তুলে নিয়ে তিনি প্রহরী দু'জনের উপরে কয়েকবার চালালেন সপাং সপাং করে। প্রহরীরা পিছিয়ে গিয়ে দুর্বোধ ভাষায় দারুণ চিৎকার করতে লাগল। বিশু ঠাকুর চাবুকটা হাতে নিয়ে উঠে এলেন ডেকের ওপরে।

প্রথমে মনে হল ডেকটা ফাঁকা। জাহাজটা বেশ জোরে চলছে, দু'পাশেই ছলাৎ ছলাৎ করছে ঢেউয়ের শব্দ। বিশু ঠাকুর দৌড়ে রেলিংয়ের কাছে গিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাবেন এমন সময় শুনলেন, সরু গলায় কে ডেকে উঠল, "ঠাকুর মশাই! ঠাকুর মশাই!"

বিশু ঠাকুর মুখ ফিরিয়ে দেখলেন একটা মাস্তুল-দণ্ডের কাছে শুয়ে আছে কুড়ানি। বিশু ঠাকুরের বুকটা ধক্ করে উঠল। কুড়ানি তা হলে এখনো বেঁচে আছে! গোখরো সাপ কমড়ালে প্রায় কেউই বাঁচে না, আর এত কষ্টের পরও কুড়ানি মরেনি। বিশু ঠাকুরই তাকে বাঁচিয়েছেন। একজন কারুর প্রাণ বাঁচাবার দারুণ আনন্দ আছে। এত বিপদের মধ্যেও বিশু ঠাকুর সেই আনন্দ বোধ করলেন।

কিন্তু কুড়ানিকে নিয়ে এখন কী করা যাবে? ওকে সঙ্গে নিয়ে জলে ঝাঁপ দিলে তুজনেরই বাঁচার আশা কম। কুড়ানি সাঁতার জানে কি না তিনি জানেন না। এই নদীতে প্রচুর কুমির থাকে।

আর চিন্তা করার সময় নেই, বিশু ঠাকুর বললেন, "কুড়ানি, তুই থাক, আমি চললাম!"

বিশু ঠাকুর রেলিং পর্যন্ত পৌঁছতে পারলেন না। তলা থেকে প্রহরী তুজন ততক্ষণে ওপরে উঠে এসেছে, অন্য দিক থেকে আরও চার-পাঁচজন দস্যু এসে গেল। বিশু ঠাকুর চার দিক ঘুরে ঘুরে চাবুক চালিয়ে আত্মরক্ষা করতে লাগলেন। কয়েকজন দস্যু তলোয়ার বার করেছে, আরকজনের হাতে চাবুক। বিশু ঠাকুর একা যুঝতে লাগলেন। কোনোক্রমে ডেকের এক ধারে আসতে পারলেই তিনি জলে ঝাঁপ দেবেন।

কিন্তু সব-কিছুর মতন, চাবুক নিয়ে লড়াই করারও একটা বিশেষ কায়দা আছে। বিশু ঠাকুর আনাড়ির মতন চাবুক চালাচ্ছিলেন, কিন্তু জলদস্যুরা চাবুকের লড়াইতে অভ্যস্ত। একজন দস্যু নিজের চাবুকটা বিশু ঠাকুরের চাবুকের সঙ্গে একবার জড়িয়ে ফেলে হ্যাঁচকা টান দিতেই বিশু ঠাকুরের হাত থেকে চাবুকটা খসে গেল। তখন দস্যুরা ঘিরে ফেলল তাঁকে।

আর লড়াইয়ের চেষ্টা করে লাভ নেই বুঝে বিশু ঠাকুর হার স্বীকার করলেন। তুজন দস্যু তাঁর টুটি টিপে ধরল। একজন দস্যু খোলা তলোয়ার উঁচিয়ে বলল, "এই কুত্তাটা অনেক ঝঞ্ঝাট করেছে, এর মুণ্ডুটা কেটে কাপ্তানের কাছে পাঠিয়ে দেব।"

বিশু ঠাকুর মৃত্যুর জন্য তৈরি হয়ে চোখ বুজলেন।

সেই সময় উঁচু থেকে বাজখাঁই গলায় একটা হুকুম শোনা গেল,

"হল্ট!"

জাহাজটি দোতলা, কিন্তু তিনতলাতেও একটি ঘর ও বারান্দা আছে। সেখানেই থাকে জলদস্যুদের সর্দার সিবাস্তিয়ান গঞ্জালেস টিবাও। সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে এতক্ষণ লড়াইটা দেখছিল, তার হাতে লম্বা পিস্তল। বিশু ঠাকুর যদি অন্যদের হারিয়ে দিয়ে জলে লাফিয়ে পড়ার চেষ্টা করত, তা হলে তখনই গুলি চালাত সে।

এবার গঞ্জালেস সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে বলল, "ওকে আমার সামনে নিয়ে এস!"

আগেই বলেছি, গঞ্জালেসের চেহারা প্রায় তিনজন মানুষের সমান। যেমন মোটা, তেমনি লম্বা। যে-কোনো সাধারণ মানুষকে সে এক হাতে চিপে মেরে ফেলতে পারে। তার গায়ে চামড়ার কোট, শীত-গ্রীষ্মে কখনো সে এই কোট খোলে না। মাথায় ঝালর-লাগানো গোল টুপি। তার চোখ দুটো সব সময় টকটকে লাল থাকে। মুখ-ভর্তি দাড়ি-গোঁফ। মানুষ না বলে তাকে দৈত্য বললেই মানায়।

দুজন দস্যু বিশু ঠাকুরের হাত আর গলা চেপে ধরে আছে। গঞ্জালেস কাছে এগিয়ে এসে বলল, "ছেড়ে দাও!"

তারপর বিশু ঠাকুরের কাঁধে এক চাপড় মেরে জিজ্ঞেস করল, "খুব জোয়ান, তাই না? দেখি হাতের গুলি? দেখি, দাঁত দেখি! হুঁ।"

হাটে গিয়ে গোরু কিংবা ছাগল কেনার সময় লোকে যেমন নানান জায়গা টিপে-টিপে দেখে, সেইরকমভাবে দেখে গঞ্জালেস বেশ সন্তুষ্টভাবে বলল, "ভাল, বেশ ভাল, জিনিস! হতভাগা বাঙালীদের মধ্যে এমন চেহারা বেশি দেখা যায় না! এমন একটা ভাল জিনিসকে কেটে ফেলছিলি? অনেক দাম পাওয়া

যাবে!”

বিশু ঠাকুর বললেন, “আমি ব্রাহ্মণ, আমাকে তোমরা কেন ধরে নিয়ে যাচ্ছ? ব্রাহ্মণ কখনো প্রাণ থাকতে ক্রীতদাস হয় না!”

গঞ্জালেস সেকথা শুনে হা-হা করে হেসে উঠল। খুব আমোদের সঙ্গে বলতে লাগল, “বামুন, অ্যাঁ, বামুন! ডার্টি হীদেন, তোরা তো সব শ্লেভ হবার জন্যই জন্মেছিস! তোকে একটা কশাইয়ের কাছে বিক্রি করে দেব, রোজ গোরু কাটবি, আর গোরুর মাংস খাবি, সেই ঠিক হবে, অ্যাঁ?”

তারপর হঠাৎ গলার আওয়াজ পাল্টে ফেলে খুব স্নেহের সঙ্গে নরম গলায় বলল, “না, না, বামুন ঠাকুরের জন্য একটা আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে। তোরা বামুনকে একটু খাতির করতেও জানিস না? এতবড় একজন মানী লোককে তোরা আর সবার সঙ্গে একসঙ্গে রেখেছিস?”

তারপর বিশু ঠাকুরের দিকে আঙুল উঁচিয়ে বলল, “বামুন মশাই, এবার মাটিতে শুয়ে পড়ো। তোমার জন্য আমরা অন্য ব্যবস্থা করছি!”

দস্যু-সর্দারের মতলব কী, তা বুঝতে পারলেন না বিশু ঠাকুর। হঠাৎ তাঁকে মাটিতে শুয়ে পড়তে বলল কেন? তিনি দাঁড়িয়েই রইলেন।

গঞ্জালেস বলল, “এই, এর হাত-পা বাঁধ! ছোট দড়ি দিয়ে হাত বাঁধবি, আর পায়ে বাঁধ লম্বা দড়ি!”

বিশু ঠাকুর কোনোরকম বাধা দেবার চেষ্টা করার আগেই চার-পাঁচজন দস্যু তাঁকে মাটিতে পেড়ে ফেলল। দারুণ শক্ত জাহাজি দড়ি দিয়ে বাঁধল তাঁর হাত আর পা। তারপর গঞ্জালেসের

নির্দেশে তাঁকে সেই অবস্থায় চ্যাংদোলা করে নিয়ে চলল খোলের দিকে।

খোলের মধ্যে সিঁড়ি দিয়ে কয়েক পা নেমে গঞ্জালেস বলল, "দে, এবার ওকে উল্টো করে ঝুলিয়ে দে।"

ডেকের নীচের দিকে একটা লোহার হুকে বিশু ঠাকুরের পায়ের দড়ি বেঁধে দেওয়া হল। তাঁর মাথাটা ঝুলতে লাগল নীচের দিকে।

নীচের বন্দীরা সেই অবস্থায় বিশু ঠাকুরকে দেখে একবার ভয়ের শব্দ করেই চুপ করে গেল।

গঞ্জালেস তাদের উদ্দেশ্যে হেঁকে বলল, "এই গ্যাখ, এই তোদের বামুন ঠাকুর। আর কেউ যদি পালাবার চেষ্টা করে, তবে তারও এই দশা হবে। এই বামুন যদি এখানে শুকিয়ে মরে ভূতও হয়ে থাকে, তবু তাকে আর নামানো হবে না।"

তারপর বিজয়ীর মতন হুংকার দিতে দিতে দস্যুরা ওপরে উঠে গেল। বিশু ঠাকুর সব বন্দীর ঠিক মাঝখানে ঝুলে রইলেন। বন্দীদের সকলের পা বাঁধা, ইচ্ছে থাকলেও কেউ এসে তাঁর কোনো সাহায্য করতে পারবে না।

একটু পরেই বিশু ঠাকুরের নাক দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল টপ-টপ করে। সেই অবস্থাতেই তিনি ভাবলেন, যদি বেঁচে থাকি, এর প্রতিশোধ নেবই, যদি বেঁচে থাকি এর প্রতিশোধ নেবই। যদি বেঁচে থাকি—

আবার তিনি ভাবলেন, যদি বেঁচে থাকি মানে? বাঁচতেই হবে, বাঁচতেই হবে, বাঁচতেই হবে। প্রতিশোধ নিতেই হবে।

এক সময় জাহাজের গতি কমে এল।

পালতোলা জাহাজ, ছোট-বড় নানান রকমের পাল আছে, যখন যেটা দরকার, সেটা তুলে দেওয়া হয়। আর যখন বাতাস থাকে না, তখন পনেরো-কুড়ি জন দাঁড় টানে। হালকা, মজবুত জাহাজ, তরতরিয়ে চলে। এ জাহাজের নাম সী হক। সিবাস্তিয়ান গঞ্জালেস টিবাওয়ের আর সাতখানা জাহাজ আছে, তবে সী হকই তার সবচেয়ে প্রিয়।

এখন ইচ্ছে করেই জাহাজটার গতি কমিয়ে আনা হতে লাগল তীরের দিকে। জায়গাটা মোহনার কাছাকাছি। নদী এখানে এত চওড়া যে কোন্‌টা নদী, কোন্‌টা সমুদ্র বোঝাই যায় না।

তীরের দিকে ঘন জঙ্গল। এদিকে অনেক দূরের মধ্যে মানুষের বসবাস নেই। এই জঙ্গলে সাংঘাতিক বাঘের উৎপাত। কিছু-কিছু এক-খড়্গাওয়ালা ছোট-আকারের গণ্ডারও আছে। সেই গণ্ডারগুলোও দারুণ হিংস্র।

তীরের কাছাকাছি এসে জাহাজ থেকে কামান গর্জে উঠল। আগুনের গোলা গিয়ে পড়তে লাগল জঙ্গলের মধ্যে। পর পর পাঁচ বার। কিছু গাছপালায় জ্বলে উঠল আগুন, সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল কয়েকটি বাঘের হুংকার।

বাঘ তাড়াবার জন্যই কামান দাগা হল এখানে। এবার দস্যুরা তীরে নামবে। কামানের গর্জন শুনে বাঘেরা আর সারাদিনে এ

তল্লাটে আসবে না।

কামান দাগবার সময় সমস্ত জাহাজটা কেঁপে ওঠে প্রচণ্ডভাবে। খোপের মধ্যে বন্দীরা এক-একজনের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তে লাগল আচমকা। কেন কামান দাগা হচ্ছে তারা কিছুই বুঝতে পারল না।

বিশু ঠাকুর অজ্ঞান হয়ে গেছেন, তিনি শুনতে পেলেন না কিছুই। তাঁর ঝোলানো শরীরটা খুব জোরে-জোরে দুলতে লাগল। একবার তাঁর শরীরটা চলে নিতাইয়ের কাছাকাছি, নিতাই হাত বাড়িয়ে ধরতে গিয়েও পারল না। কামান দাগা থেমে যেতেই বিশু ঠাকুরের শরীরের দোলানিও থেমে এল আস্তে-আস্তে, আর নিতাইয়ের কাছে এল না।

একটু পরে ডেকের ওপর থেকে দড়ির সিঁড়ি নামিয়ে দেওয়া হল নীচে। কয়েকজন দস্যু নেমে গেল তীরে। জঙ্গলের মধ্যে খানিকটা ঘুরে দেখে এসে তারা হুইসল বাজাল। অর্থাৎ কাছাকাছি আর হিংস্র জন্তু-জানোয়ার নেই। তখন অন্যরাও নামতে শুরু করল।

এবার জাহাজের খোলের কাছের দরজাটা খুলে দিয়ে বার করা হল বন্দীদের। তার আগে তাদের পায়ের শিকল খুলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই ক'দিন তাদের পা বাঁধা ছিল বলে পা যেন অসাড় হয়ে গেছে, হাঁটতে গিয়েও পড়ে যেতে লাগল অনেকে। প্রহরীরা তাদের ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেল।

তীরের কাছে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে গঞ্জালেস দেখছে বন্দীদের। হঠাৎ একজন বন্দীর ঘাড় খামচে ধরে তাকে সে টেনে আনল আলাদা করে। লোকটির পরনে শুধু একটা লুঙ্গি আর খালি গা। গঞ্জালেস তাকে জিজ্ঞেস করল, "এই, তোর নাম কী?"

লোকটির মুখ শুকিয়ে গেছে। সে হাত জোড় করে বলল,

"ছায়েব, আমি আপনার গোলাম, আমার নাম কাল্লু মিঞা !"

গঞ্জালেস হুঙ্কার দিয়ে বলল, "আগে আমায় সালাম করিসনি কেন ? সালাম না করে কথা ?"

সঙ্গে সঙ্গে সে ঠাস ঠাস করে দুটি চড় কষাল কাল্লু মিঞার দুই গালে। শুধু তাই নয়, তাকে জোরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল মাটিতে। কাল্লু মিঞা পড়ে গেল চিত হয়ে, গঞ্জালেস তাকে আবার পা দিয়ে ঠেলে তাকে উপুড় করে দিল, তারপর সে তার বিশাল চেহারা নিয়ে উঠে দাঁড়াল কাল্লু মিঞার পিঠে।

কাল্লু মিঞা আঁক্ করে শব্দ করে উঠল। অন্য বন্দীরা হাঁ করে তাকিয়ে আছে।

গঞ্জালেস সেই অবস্থায় লাফাতে লাগল কাল্লু মিঞার পিঠে। ঠিক যেন নাচছে।

তারপর নেমে দাঁড়িয়ে একজন অনুচরকে জিজ্ঞেস করল, "ছাখ তো, এ ব্যাটা বেঁচে আছে কি না।"

অনুচরটি কাল্লু মিঞাকে গড়িয়ে দিল কয়েক পাক। কাল্লু মিঞার নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে, কিন্তু তার চোখ দুটি খোলা। দেখেই বোঝা যায়, তার জ্ঞান আছে।

অনুচরটি ধমকে বলল, "এই, ওঠ !"

কাল্লু মিঞা অমনি উঠে দাঁড়াল !

"কাপ্তানকে সালাম কর !"

কাল্লু মিঞা সেলাম ঠুকল সঙ্গে সঙ্গে।

গঞ্জালেস এবার খুশি হয়ে বলল, "ঠিক আছে। এ-রকম তাগতওয়ালা লোকই আমার দরকার !"

তারপর আবার সে তীক্ষ্ণ চোখে দেখতে লাগল বন্দীদের

মুখগুলো। আবার আর একজনের কাঁধ খামচে ধরে টেনে নিয়ে এল। লোকটি বৃদ্ধ, তার মুখে সাদা রঙের দাড়ি। কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই সে বলল, "ছালাম ছায়েব, ছালাম! পেন্নাম ছায়েব, পেন্নাম! মুই বুধুরাম।"

গঞ্জালেস তার অনুচরকে জিজ্ঞেস করল, "এই বুড়াটাকে এনেছিস কেন? এই মড়াটাকে কে কিনবে? শুধু শুধু দানাপানি দিয়ে এটাকে পুষে লাভ কী?"

অনুচরটি তলোয়ারের বাঁটে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কাপ্তান একে শেষ করে দিই?"

বুধুরাম হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠে বলল, "আমায় মারবেন না ছায়েব, মারবেন না। বুড়া হলেও আমার গায়ে তাগদ আছে। মুই মাথায় দশ কাঁদি ডাব বইতে পারি, দুই বস্তা ধান নিতে পারি—"

গঞ্জালেস তার অনুচরকে বলল, "এর পিঠে চাপ।"

সে অমনি বুড়োটির পিঠে লাফিয়ে উঠে তার গলা চেপে ধরল।

গঞ্জালেস বলল, "দৌড়ো!"

অতবড় চেহারার একজন জলদস্যুকে পিঠে নিয়ে বুড়োটি একেবারে বেঁকে গেছে, তবু সেই অবস্থায় সে দৌড়োল। কোনোরকমে পড়ি-মরি করে দৌড়োতে দৌড়োতে সে ঢুকে গেল জঙ্গলের মধ্যে।

গঞ্জালেস তখন অন্য বন্দীদের বলল, "তোরাও সব দৌড়ো ওদিকে!"

জঙ্গলের মধ্যে একটু ঢুকেই বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা। সেখানকার গাছ সব কেটে ফেলা হয়েছে। একটা পুকুরও কাটা হয়েছে সেখানে, তার পাশেই একটা ইটের ভাটি। ঐ পুকুরের মাটি

দিয়েই ইট বানানো হচ্ছে।

এখানে শুরু হয়েছে একটা গম্বুজ বানাবার কাজ। জলদস্যুরা এখানে একটা আস্তানা বানাবে। বোম্বেটের প্রধান আড্ডা চট্টগ্রামের কাছে সন্দীপ নামে একটা দ্বীপে। তার পাশেই আরাকান। কিন্তু কিছুদিন হল, মগদের সঙ্গে ফিরিঙ্গি দস্যুদের ভেতরে ভেতরে একটা গোলমাল চলছে, তাই ফিরিঙ্গিরা দূরে আর এক জায়গায় তাদের একটা ঘাঁটি করে রাখতে চায়।

গ্রাম থেকে ধরে আনা মানুষগুলোকে ক্রীতদাস হিসেবে বিক্রি করে দেবার আগে কয়েকদিন তাই তাদের গম্বুজ বানাবার কাজে লাগিয়ে দেয় এখানে।

বন্দীরা সবাই মাটি কাটার কাজে লেগে গেল, তাদের ঘিরে রইল প্রহরীরা। অবশ্য বন্দীরা কেউ পালাতে সাহস করবে না। কারণ সুন্দরবনের মানুষ জানে, এই গভীর জঙ্গলের মধ্যে একা একা পালাতে গেলে নির্ঘাত বাঘের খপ্পরে পড়বে। আর নদী সাঁতরে যাওয়ারও উপায় নেই, নদীতে থিকথিক করছে কুমির।

বন্দীদের কাজে লাগিয়ে দিয়ে গঞ্জালেস কয়েকজন অনুচরকে নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে গেল হরিণ কিংবা শুয়োর শিকার করতে। গঞ্জালেস দারুণ সাহসী, বাঘের মুখোমুখি হলেও সে ভয় পায় না, একবার সে শুধু ছুরি হাতে একটা বাঘের সঙ্গে লড়েছিল। তার পিঠে বাঘের থাবার দাগ আছে।

এদিকে জাহাজের শূন্য খোলটার মধ্যে শুধু দুলতে লাগল বিশু ঠাকুরের দেহটা। ঠিক ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতন।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল কুড়ানি। জলদস্যুরা সবাই মিলে তীরে নামবার সময় কুড়ানির কথা ভুলেই গিয়েছিল।

ডেকের ওপর বিশু ঠাকুরকে যখন মারধোর করা হয়, তখন ভয়ে কুঁকড়ে মাস্তুলের ডাণ্ডার আড়ালে সে বসেছিল, অন্যরা আর তাকে খেয়ালই করেনি। জাহাজে এখন আর কেউ নেই।

এবার সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে ফিসফিস করে ডাকতে লাগল, "ঠাকুর মশাই! ঠাকুর মশাই!"

কোনো সাড়া নেই। সাড়া পাবেই বা কী করে, বিশু ঠাকুর অনেকক্ষণ ধরেই অজ্ঞান। মানুষ কখনো নীচের দিকে মাথা করে ঝুলে থাকতে পারে? সব রক্ত এসে মাথায় জমে। বেশিক্ষণ অমনিভাবে থাকলে মানুষ মরেই যায়।

কয়েকবার ডেকে ডেকেও সাড়া না পেয়ে কুড়ানি বেশ ঘাবড়ে গেল। এখন সে কী করবে? ঠাকুর মশাইকে বাঁচাতেই হবে।

সে আবার উঠে এল ওপরে। সমস্ত জাহাজটা খুঁজে দেখতে লাগল। দস্যুরা জাহাজে কোনো পাহারা রেখে যায়নি। এখানে তো মানুষজন আসবার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

খুঁজতে খুঁজতে কুড়ানি দেখল, একটা ঘরের মধ্যে অনেক তলোয়ার বর্শা রাখা আছে। কুড়ানি প্রথমে একটা তলোয়ার নেবার চেষ্টা করল। এদের তলোয়ার বেশ ভারী হয়, কুড়ানি ঐটুকু মেয়ে, সে দু'হাতে একটা তলোয়ার তুলেও বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারল না। তখন সে তলোয়ার রেখে একটা বর্শা তুলে নিল, এটাও বেশ ভারী, তবে সে উঁচু করে রাখতে পারে।

বর্শাটা নিয়ে সে চলে এল জাহাজের খোলে। তারপর সিঁড়ি থেকে ঝুঁকে সে বর্শার ফলা দিয়ে কাটার চেষ্টা করল দড়িটা। ভীষণ শক্ত জাহাজি দড়ি, তা কাটা সহজ নয়। তবু তলোয়ার দিয়ে কাটা যেতে পারত, কিন্তু বর্শা দিয়ে খোঁচা মারলেই বিশু ঠাকুরের শরীরটা

বেশি ফুলে ওঠে।

ভয়ে কুড়ানির বুক ঢুপ-ঢুপ করছে। যে-কোনো মুহূর্তে ডাকাতরা ফিরে আসতে পারে। তার আগে ঠাকুর মশাইয়ের দড়ি কাটতেই হবে। সে প্রাণপণে লক্ষ্য ঠিক রেখে বর্শার ফলাটা দিয়ে দড়ির ওপর পোঁচ লাগাতে লাগল। মনে হচ্ছে যেন এক যুগ কেটে যাচ্ছে। তারপর এক সময় হঠাৎ দড়ি ছিঁড়ে নীচে পড়ে গেলেন বিশু ঠাকুর। কাঠের মেঝেতে তাঁর মাথাটা ঠুকে গেল ঠকাং করে। আর অমনি এক পাশ কেটে গিয়ে রক্ত বেরুতে লাগল।

কুড়ানি এবার দৌড়ে নেমে গিয়ে বিশু ঠাকুরের পাশে বসে পড়ে মাথাটা তুলে নিল নিজের কোলে। কাছাকাছি কোনো জিনিসও নেই যে রক্ত মুছবে। সে কাটা জায়গাটা হাত দিয়ে চেপে রেখে ব্যাকুলভাবে ডাকতে লাগল, "ঠাকুর মশাই! ঠাকুর মশাই!"

বিশু ঠাকুরের শরীরে একটুও স্পন্দন নেই।

কুড়ানি ভাবল, চোখে-মুখে জল ছেটালে বোধহয় কাজ হবে। সে আবার ছুটে গেল ওপরে। সে দেখেছে, দস্যুরা একরকম চামড়ার থলি থেকে প্রায়ই চুমুক দিয়ে জল খায়। অনেক সময় ঐ চামড়ার থলি তাদের কোমরে বাঁধা থাকে। সে দেখেছে, একটা ঘরে ঐরকম অনেকগুলো থলি রাখা আছে।

কুড়ানি যে-জিনিসটাকে জল ভাবছে, তা আসলে জল নয়। ওর নাম বুলেপঞ্জ। ওগুলো একরকমের নেশার জিনিস, ডাকাতরা সারাদিনই ঐ বুলেপঞ্জ মাঝে মাঝে এক চুমুক করে খায়, তাতে শরীর চাঙ্গা হয়।

সেই এক থলি বুলেপঞ্জ নিয়ে এসে কুড়ানি প্রথমে বিশু ঠাকুরের হাত ও পায়ের বাঁধন খুলে দিল। তারপর জল ভেবে সেই বুলেপঞ্জ

ছেটাতে লাগল তাঁর চোখে-মুখে। মাথার কাটা জায়গাটাও ধুয়ে দিল। জোর করে ঠোঁট দুটো ফাঁক করে খানিকটা ঢেলে দিল গলায়।

তারপর ধাক্কা দিতে দিতে সে ডাকতে লাগল, "ঠাকুর মশাই, ঠাকুর মশাই, উঠুন। শিগগির উঠুন!"

তবু বিশু ঠাকুর চোখ মেললেন না।

কুড়ানি ভাবছে যে, বিশু ঠাকুর এখন জ্ঞান ফিরে পেলে তারা দু'জনে পালাতে পারবে। সারা পৃথিবীতে কুড়ানির আর কেউ নেই। এই বিশু ঠাকুরই তার সঙ্গে নিজের বড় ভাইয়ের মত ব্যবহার করেছেন, উনি তাকে সাপে কামড়াবার পরও বাঁচিয়েছেন।

হঠাৎ কুড়ানির সারা শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল। একটা কথা ভেবেই দারুণ ভয় পেয়ে গেল সে। তার মনে হল, বিশু ঠাকুর যদি মরে গিয়ে থাকেন? নিশ্চয়ই মরে গেছেন। এত ডাকেও সাড়া দিচ্ছেন না কেন? তা হলে এখন তাঁর কী হবে?

আর কিছু ভাবতে না পেরে কুড়ানি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

॥ ৫ ॥

শায়েস্তা খাঁ তাঁর বিশাল বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হলেন ঢাকায়। বাংলার সুবেদার হয়ে তিনি চারদিকে প্রচার করে দিলেন যে, মোগল শাসন যে অমান্য করবে, তাকে তিনি একেবারে শায়েস্তা করে দেবেন। আসলে বাংলায় তার আগে শায়েস্তা বলে কোনো

কথাই ছিল না! শায়েস্তা খাঁ আসার পরই কথাটা চালু হল।

বাংলায় তখন ছোট ছোট জমিদাররা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। তারা নিজেদের স্বাধীন মনে করত। তাদের অনেকেরই পেশা ছিল ডাকাতি করা। দিনের বেলা তারা রাজা, রাত্তিরবেলা ডাকাত। শায়েস্তা খাঁ সৈন্য পাঠিয়ে এক এক করে এই সব ডাকাত-জমিদারদের ঠাণ্ডা করতে লাগলেন।

এইসব জমিদারদের দমন করা তেমন শক্ত নয়, কারণ এদের একটা করে নির্দিষ্ট জায়গা আছে, সেখানে আক্রমণ করা যায়। কিন্তু জলদস্যুদের ধরা তত সহজ কাজ নয়, তাদের খোঁজ পাওয়াই তো কঠিন। তারা ঝড়ের বেগে এসে কোনো জায়গায় ঝাঁপিয়ে পড়ে, তারপর খুব তাড়াতাড়ি লুটপাট করে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে সরে পড়ে। বাংলা দেশে অসংখ্য নদী-নালা, তার মধ্যে কোথায় যে তারা ঘাপটি মেরে থাকে, তা জানবার উপায় নেই। আর কখনো বা তাদের দেখতে পেয়ে তাড়া করলে একেবারে সমুদ্রের বুকে মিলিয়ে যায়।

শায়েস্তা খাঁর এক সেনাপতির নাম তকী খাঁ। এই তকী খাঁ সুবেদার শায়েস্তা খাঁর একেবারে ডান হাতের মতন। শায়েস্তা খাঁ মোটাসোটা, ভারী চেহারার মানুষ আর এই তকী খাঁ ছিপছিপে লম্বা, চিবুকে একটুখানি নূর, চোখ দুটি ঝকঝকে। যেমন সে লড়াইতে দক্ষ, তেমন তার বুদ্ধি।

স্বয়ং সম্রাট আওরঙ্গজেব হুকুম দিয়েছেন যে, যেমন করেই হোক বাংলা থেকে ফিরিঙ্গি বোম্বেটেদের একেবারে নিকেশ করতেই হবে। সেইজন্য শায়েস্তা খাঁ প্রথম কিছুদিন ঢাকায় বসে রাজ্যশাসনে মন দিয়ে তকী খাঁর ওপর ভার দিলেন জলদস্যুদের দমন করার।

তকী খাঁ জাহাজ নিয়ে জলপথে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু কোথাও জলদস্যুদের দেখা পায় না। অথচ তাদের অত্যাচার ঠিকই চলছে।

দু'মাস বাদে শায়েস্তা খাঁ তকী খাঁকে ডেকে খোঁজখবর নিলেন।

তকী খাঁ লম্বা সেলাম ঠুকে লজ্জিতভাবে বলল, "মালেক, আজ পর্যন্ত তাদের দেখাই পেলাম না তো লড়াই করব কী? এমন দুশমনের কথা আমি আগে শুনিনি!"

শায়েস্তা খাঁ বললেন, "তামাম বাংলায় জলদস্যুদের অত্যাচারে হাহাকার পড়ে গেছে। সব জায়গায় তাদের অত্যাচার চলছে। আর তুমি তাদের দেখাই পেলে না? এ কী আজব কথা!"

তকী খাঁ বলল, "মালেক, আমার ধারণা, ওদের গুপ্তচর আছে। আমরা যখন যেখানে যাই, ওরা আগে থেকেই তার সন্ধান পেয়ে যায়। আর অমনি সরে পড়ে।"

শায়েস্ত খাঁ বললেন, "গুপ্তচর কারা তাদের খুঁজে বার করো। আর ধরে ধরে কোতল করো।"

তকী খাঁ বলল, "আমরা এখানে পরদেশী, ওদের গুপ্তচরদের আমাদের পক্ষে চেনা শক্ত। আমাদেরও কিছু গুপ্তচর রাখা দরকার। এখানকার কিছু লোকদেরই শিখিয়ে-পড়িয়ে কাজে লাগাতে হবে।"

শায়েস্তা খাঁ বললেন, "তবে আর দেরি না করে তাই করো! এ বছরের মধ্যেই জাঁহাপনা আলমগিরের কাছে আমাদের জয়ের খবর পাঠাতে চাই।"

পাঁচশো লোককে গুপ্তচরের কাজ শিখিয়ে ছড়িয়ে দেওয়া হল সুবে-বাংলায়। তারা ফকির, দরবেশ, ভিখারি সেজে নানান জায়গায় ঘুরে বেড়ায়।

সেই গুপ্তচররা একবার খবর আনল যে, সুন্দরবনের রায়মঙ্গল নদীর ধারে মোল্লাখালি নামে একটা জায়গায় জলদস্যুদের একটা ঘাঁটি আছে। সেখানকার তিন-চারখানি গ্রাম দস্যুরা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে একেবারে ছারখার করে দিয়েছে, মানুষজন সব পালিয়েছে। নানান জায়গায় ডাকাতি করার পর জলদস্যুরা সেখানে কয়েকদিনের জন্য বিশ্রাম নিতে আসে।

তকী খাঁ চারখানি জাহাজে সৈন্য সাজিয়ে বেরিয়ে পড়ল অভিযানে।

রায়মঙ্গল নদীতে মোল্লাখালির প্রায় কাছাকাছি এসে গেছে জাহাজগুলো। কামান সাজানো আছে, সৈন্যরা খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে তৈরি। তকী খাঁর খুব ইচ্ছে, একবার ডাঙায় নেমে দস্যুগুলোকে সামনে পেলে হয়। মুখোমুখি যুদ্ধে মোগলদের সঙ্গে কেউ পারবে না। জলের ওপর যুদ্ধ করার অভ্যেস নেই তকী খাঁর। তবে জাহাজে শক্তিশালী কামান আছে, দস্যুরা কাছে ঘেঁষতে পারবে না।

বিকেল হয়ে গেছে বলে তকী খাঁ নদীর বাঁকের আড়ালে নোঙর ফেলার হুকুম দিল। অচেনা জায়গায় সন্ধের পর যুদ্ধ শুরু না করাই ভাল। গুপ্তচরের মুখে তকী খাঁ আগেই খবর জেনেছে যে যদি পালাবার চেষ্টা করে, তাহলে জলদস্যুদের এই দিক দিয়েই পালাতে হবে। কেননা, অন্যদিক দিয়ে পালাতে গেলে তারা একেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়বে, সেদিক দিয়ে আর সমুদ্রে বেরুবার পথ নেই।

তকী খাঁ প্রত্যেক জাহাজে সৈন্যদের সজাগ হয়ে পাহারায় থাকতে বলে দিল।

মাঝরাত্রে একটা জাহাজে দারুণ শোরগোল শোনা গেল। দুটো বাঘ কখন সাঁতরে এসে সেই জাহাজে উঠে পড়েছে। সুন্দরবনের বাঘ এমন সাহসী যে, মোগল সৈন্যদেরও পরোয়া করে না। বাঘের হুংকার আর লোকজনের ভয়ার্ত চিৎকারে খানখান হয়ে যেতে লাগল রাত্রির নিস্তব্ধতা।

বাঘের সঙ্গে লড়াই করার শিক্ষা তো মোগল সৈন্যরা পায়নি। তারা প্রথমে ভাবল, জলদস্যুরা বুঝি জাহাজে বাঘ পাঠিয়ে দিয়েছে। অনেকে ভয়ে জাহাজের খোলের মধ্যে লুকোল। ক্রুদ্ধ বাঘের গর্জন শুনলেই বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। কয়েকজন সৈন্য বুদ্ধি করে জ্বলন্ত মশাল ছুঁড়ে মারতে লাগল বাঘ দুটির ওপর। তকী খাঁ নিজে অন্য জাহাজ থেকে লাফিয়ে চলে এল বাঘের সঙ্গে লড়তে।

শেষ পর্যন্ত একটা বাঘকে মারা গেল কোনোরকমে, অন্য বাঘটি জলে লাফিয়ে পড়ে সাঁতরে পালাল। সাতজন মোগল সৈন্য মারা গেল আর আহত হল পনেরো-কুড়িজন।

বাঘের কথা ভেবেই জাহাজগুলো তীরের কাছে না ভিড়িয়ে রাখা হয়েছিল মাঝ-নদীতে। সুন্দরবনের বাঘ যে সাঁতরেও আসে, তা মোগল সৈন্যরা জানত না।

পরদিন সকালে মোগলবাহিনী মোল্লাখালিতে নেমে দেখল সেখানে একটিও ডাকাত নেই। কয়েকটি চালাঘর ও কিছু কিছু বাসনপত্র দেখে বোঝা যায়, সেখানে মাঝে মাঝেই মানুষজন আসে। আর রয়েছে দু-তিনটি গোরু আর শ' খানেক মুরগি। এই বাঘের দেশে তো কেউ এমনভাবে গোরু ফেলে রেখে যায় না!

গুপ্তচরদের মুখে তকী খাঁ পাকা খবর পেয়েছিল যে, মাত্র তিন-দিন আগেই সেখানে একদল জলদস্যু এসেছে, তাদের তিনখানা

জাহাজও দেখা গেছে। সাধারণত তারা আট-দশ দিন বিশ্রাম নেয়। তবে কি ডাকাতরাও আগে থেকে খবর পেয়ে পালিয়েছে? কিন্তু পালাল কোন্ পথ দিয়ে? এই ডাকাতগুলো কি জাদু জানে?

জাহাজ নিয়ে কাছাকাছি নদীগুলোতে ঘুরে দেখে এল তকী খাঁ। কোথাও জলদস্যুদের কোনো চিহ্ন নেই। এবারের অভিযানও ব্যর্থ হল। রাগের চোটে তকী খাঁ মোল্লাখালিতে ডাকাতদের যতগুলো চালাঘর ছিল সব-ক'টিতে আগুন ধরিয়ে দিল। আর গোরু ও মুরগিগুলোকে কেটেকুটে খেয়ে ফেলল সৈন্যরা।

তিন দিন মোল্লাখালিতে অপেক্ষা করার পর তকী খাঁ ফিরে যাওয়াই ঠিক করল। রাত্রে বাঘের গর্জন শুনে কিছুতেই ঘুম আসে না। এ-রকম জায়গায় আর পড়ে থাকার কোনো মানে হয় না।

মোগলদের জাহাজগুলো মোল্লাখালি ছেড়ে কিছুদূর মাত্র এগিয়েছে, এমন সময় ঝড় উঠল। সকালবেলাও আকাশ ছিল নীল, অথচ কোথা থেকে ধেয়ে এল রাশি রাশি মেঘ। আর সে কী তুমুল ঝড়! নদীতেও ঢেউ উঠল সমুদ্রের মতন। বড় বড় জাহাজগুলো হেলে পড়তে লাগল, একটা জাহাজ উলটেই গেল!

অধিকাংশ মোগল সৈন্যই সাঁতার জানে না। আর রায়মঙ্গল নদী অতি বিশাল, প্রবল স্রোতের মধ্যে সাঁতার জানলেও বিশেষ সুবিধে হয় না। তার ওপর আছে কুমির আর কামঠের উপদ্রব। মোগল সৈন্যরা হাত-পা ছুঁড়ে ডুবে যেতে লাগল। অন্য জাহাজের লোকেরা তাদের বাঁচাবার চেষ্টা করবে কী, তারা তাদের নিজেদের প্রাণ বাঁচাতেই ব্যস্ত।

ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে নামল বৃষ্টি, চতুর্দিক ঝাপসা হয়ে এল, কিছুই দেখা যায় না।

হঠাৎ ধুড়ুম করে এক কামানের গোলা এসে পড়ল তকী খাঁর জাহাজে। কোথা থেকে, কে কামান দাগল ? ভাবতে না ভাবতেই আরও কয়েকটি কামানের গর্জন ভেসে এল। তকী খাঁর জাহাজ ফুটো হয়ে জল ঢুকতে লাগল হুড়হুড়িয়ে।

আসলে হয়েছিল কী, সুন্দরবনের জঙ্গলের মধ্যে অসংখ্য খাঁড়ি আছে, সেখানে শুধু নৌকো যায়, বোম্বেটেরা তাদের ছোট ছোট জাহাজ নিয়ে লুকিয়ে ছিল সে-রকম একটা খাঁড়িতে। চার পাশে এমন জঙ্গল যে, একটু দূর থেকেও কিছু দেখা যায় না। আর মোগলরা এদিককার নদীপথ চেনে না, তাদের পক্ষে তো সন্ধান পাবার উপায়ই নেই। ঝড়বৃষ্টি শুরু হবার পর ফিরিঙ্গি দস্যুরা মোগল জাহাজগুলোর দিকে ধেয়ে এসেছে।

জলদস্যুরা বারো মাসই প্রায় নদী বা সমুদ্রের ওপর কাটায়, সুতরাং ঝড়বৃষ্টিকে তারা গ্রাহ্য করে না। মোগলদের অনেক বেশি সৈন্য ও বড় বড় কামান থাকলেও তারা লড়াইতে সুবিধে করতে পারল না। তারা দেখতেই পাচ্ছে না যে, বোম্বেটেরা কোন্ দিক থেকে আক্রমণ করছে! তারাও এলোমেলো ভাবে কামান দাগতে শুরু করল।

মোগলদের একটি জাহাজ আগেই ডুবে গিয়েছিল, তকী খাঁর জাহাজটাও ডুবতে শুরু করল। অন্য দুটি জাহাজ রণে ভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে গেল। তকী খাঁ-ও সাঁতার জানে না, জলে ডুবে মরার ভয়ে সন্ধি করার জন্য তার জাহাজে উড়িয়ে দিল সাদা পতাকা।

জলদস্যুরা সন্ধি-টন্ধি গ্রাহ্য করে না। সেই ডুবন্ত জাহাজের চারপাশে ঘুরে ঘুরে গোলা চালাতে লাগল তারা। মোগল সৈন্যরা প্রাণভয়ে দিকবিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। শুধু

তকী খাঁ একা বীরের মতন খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল ডেকের ওপর।

একসময় তাকে নিয়েই গোটা জাহাজটা ভুস করে ডুবে গেল রায়মঙ্গল নদীতে।

জলদস্যুদের সঙ্গে প্রথম লড়াইতে হার হল মোগল বাহিনীর।

এই লড়াইতে জলদস্যুদের নেতা ছিল গঞ্জালেসের ভাই। সে এই দারুণ সংবাদ শোনাবার জন্য সমুদ্র-মোহনার দিকে ছুটল।

যথাসময়ে এই খবর শুনে শায়েস্তা খাঁ একই সঙ্গে রাগ ও দুঃখে অধীর হয়ে পড়লেন। তকী খাঁ ছিল তাঁর অতি প্রিয় সেনাপতি। এমন ভাবে, প্রায় বিনা যুদ্ধে হেরে গিয়ে তকী খাঁকে প্রাণ হারাতে হল, এর চেয়ে লজ্জার আর কী থাকতে পারে! তাছাড়া, জলদস্যুদের কাছে এমনভাবে হেরে যাবার সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে বাংলার মানুষের কাছে মোগলদের মান থাকবে না।

শায়েস্তা খাঁ ঠিক করলেন, আলাদা আলাদা ভাবে জলদস্যুদের দলগুলির সঙ্গে লড়াই করে বিশেষ কিছু লাভ হবে না। একই সঙ্গে মগ ও ফিরিঙ্গি দস্যুদের দমন করতে হলে তাদের মূল ঘাঁটিটাই ভেঙে দেওয়া দরকার। এজন্য চট্টগ্রাম দখল করতে হবে। চট্টগ্রাম এবং তার আশপাশের দ্বীপগুলিতেই ওদের পরিবারের লোকজন থাকে। তাদের ধরতে পারলেই অনেকখানি কাজ হবে।

স্থলপথে পঁচিশ হাজার সৈন্য এবং জলপথে এগারোখানি যুদ্ধজাহাজ নিয়ে শায়েস্তা খাঁ নিজে চললেন চট্টগ্রাম জয় করতে।

॥ ৬ ॥

এদিকে বিশু ঠাকুরের এক সময় জ্ঞান ফিরল। তখনো কুড়ানি তাঁর পাশে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

প্রথমে তিনি কিছুই বুঝতে পারলেন না। মাথায় অসহ্য ব্যথা। সমস্ত শরীরের তুলনায় মাথাটা অসম্ভব রকম ভারী হয়ে গেছে, কিন্তু খুব চেষ্টা করেও তুলতে পারলেন না মাথা। চোখের পাতা খুললেই যেন মনে হচ্ছে চোখের মধ্যে ফুটে যাচ্ছে হাজার হাজার সুঁচ।

যন্ত্রণা আর সইতে না পেরে তিনি বলে উঠলেন, "উফ্! মাগো!"

কুড়ানির কান্না থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে। সে বুঝতে পারল, ঠাকুর মশাই বেঁচে আছেন! সে অমনি বিশু ঠাকুরের বুকে হাত দিয়ে ধাক্কা দিতে দিতে বলতে লাগল, "ঠাকুর মশাই! ঠাকুর মশাই! উঠুন!"

বিশু ঠাকুরের মনে হল যেন বহু দূর থেকে কেউ তাঁকে ডাকছে।

তিনি অতি কষ্টে উচ্চারণ করলেন, "জল! একটু জল!"

কুড়ানি অমনি জল ভেবে চামড়ার থলে থেকে আরও খানিকটা বুলেপঞ্জ ঢেলে দিল বিশু ঠাকুরের গলায়। যেহেতু বুলেপঞ্জ খুব কড়া ধরনের আরক, তাই সেটাতে বিশু ঠাকুরের গলা জ্বালা করতে লাগল। এবং তার ফলেই তাঁর শরীরে খানিকটা জোর এল।

এবার তিনি কুড়ানির 'ঠাকুরমশাই' 'ঠাকুরমশাই' ডাক অনেকটা স্পষ্ট শুনতে পেলেন। তিনি জোর করে চোখ খুললেন। কিন্তু দেখলেন শুধু মিশমিশে অন্ধকার। যদিও তখন বিকেলবেলা, জাহাজের

খোলের মধ্যেও আলো আছে।

তিনি কুড়ানিকে দেখতে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কে ?"

"ঠাকুরমশাই, আমি কুড়ানি !"

বিশু ঠাকুরের মনেই পড়ল না যে, তিনি কোথায় আছেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এত রাত্তিরে তুই কী করছিস ?"

কুড়ানি বলল, "ঠাকুরমশাই, ওখন রাত্তির কোথায়, এখন বিকেল। শিগগির উঠুন, এখন ডাকাতরা কেউ নেই, পালাতে হবে।"

বিকেল কথাটা শুনে বিশু ঠাকুর একটু চমকে উঠলেন। তিনি উঠে বসবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কিছুতেই পারলেন না।

তিনি বললেন, "কুড়ানি, আমার মাথাটা তুলে ধর !"

কুড়ানির গায়ে কতটুকুই বা জোর। তবু সে অতিকষ্টে বিশু ঠাকুরের মাথাটা টেনে তুলল। বিশু ঠাকুর উঠে বসেও আবার পড়ে যাচ্ছিলেন, কোনোরকমে কুড়ানিকে ধরে রইলেন। শরীরে এত কষ্ট হচ্ছে যে, আর যেন সহ্য করতেই পারবেন না, এক্ষুনি প্রাণ বেরিয়ে যাবে। তিনি যন্ত্রণায় 'ওফ্' 'ওফ্' করতে লাগলেন।

একটু বাদে খানিকটা দম নিয়ে তিনি বললেন, "কুড়ানি, তোকে আমি দেখতে পাচ্ছি না কেন ? আমি কি অন্ধ হয়ে গেলুম !"

কুড়ানি কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, "না, ঠাকুরমশাই, না না, আপনি অন্ধ হবেন না। আপনাকে ওরা উলটো করে ঝুলিয়ে রেখেছিল। আমি দড়ি কেটে দিয়েছি। ওরা ফিরে এসে আপনাকে দেখলে মেরে ফেলবে। আমাকেও মেরে ফেলবে।"

বিশু ঠাকুরের মনে হল, তাঁর এখন মরে যাওয়াই ভাল। মরলেই তো সব যন্ত্রণা কমে যাবে।

পরমুহূর্তেই তিনি আবার মাথা ঝাঁকালেন। না, বাঁচতেই হবে,

যে-রকম ভাবেই হোক, বাঁচতেই হবে।

তিনি বললেন, "জল বলে কী খাওয়ালি? আমাকে আবার একটু দে তো!"

কুড়ানি চামড়ার থলিটা এগিয়ে দিল। বিশু ঠাকুর ঢকঢক করে সবটা বুলেপঞ্জ খেয়ে ফেললেন। তাতে যেন তাঁর শরীরে অনেকটা শক্তি ফিরে এল। চোখের অন্ধকারটা একটু-একটু করে ঝাপসা হতে-হতে ক্রমে মিলিয়ে গেল। তিনি দেখতে পেলেন কুড়ানিকে।

কুড়ানি ব্যাকুলভাবে ফিসফিস করে বলল, "ঠাকুরমশাই, ডাকাতরা সবাই নীচে নেমে গেছে। চলুন, এই বেলা আমরা পালাই!"

বিশু ঠাকুর বললেন, "আমার মাথায় বড্ড ব্যথা রে, কুড়ানি, আমি মাথা তুলে রাখতে পারছি না! আমার আবার শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে!"

"ডাকাতরা আবার যে-কোনো মুহূর্তে এসে পড়তে পারে!"

বিশু ঠাকুর আস্তে আস্তে অতি কষ্টে দেয়াল ধরে উঠে দাঁড়ালেন। কুড়ানি বর্শাটা তুলে এনে বলল, "এই যে, এটা নিন!"

বিশু ঠাকুর বর্শাটাকে লাঠির মতন করে ধরলেন। তারপর খানিকটা দম নেবার পর জিজ্ঞেস করলেন, "বাকি লোকরা কোথায় গেল?"

"তাদের পারে নিয়ে গেছে। সেখানে খুব জঙ্গল!"

"তোকে নিয়ে গেল না কেন?"

"আমায় দেখতে পায়নি!"

"চল দেখি যাওয়া যায় কি না।"

বুড়ো মানুষের মতন বর্শাটাকে লাঠির মতন ভর দিয়ে তিনি টলতে-টলতে এগোলেন সিঁড়ির দিকে। পা যেন আর চলছেই না!

সিঁড়ির কাছে গিয়ে তিনি এক পা উঠতে গিয়ে পড়ে গেলেন হুড়মুড়িয়ে। কুড়ানি তাঁকে ধরতে গিয়েও পারল না।

বিশু ঠাকুর আবার আস্তে-আস্তে উঠলেন। এবার শান্তভাবে বললেন, "চল কুড়ানি, যেতে তো হবেই! প্রাণ থাকতে আমি ক্রীতদাস হব না!"

ছেঁচড়ে-ছেঁচড়ে তিনি উঠলেন সিঁড়ি দিয়ে। ওপরে এসেই তিনি শুয়ে পড়লেন আবার। বহুক্ষণ তাঁকে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল বলে, সব রক্ত এসে গেছে মাথায়, তাঁর শরীরে আর একটুও জোর নেই। কুড়ানি দড়ি কেটেনা নামালে আরকিছুক্ষণের মধ্যেইতিনি মরেযেতেন।

কুড়ানি আবার তাঁকে ঠেলতে লাগল।

"ঠাকুরমশাই, উঠুন, উঠুন!"

"আমি আর পারছি না রে!"

কুড়ানি ছুটে গিয়ে জাহাজের ভাঁড়ার-ঘর থেকে আর-একটি বুলেপঞ্জের থলি এনে বলল, "ঠাকুরমশাই, আর একটু জল খাবেন?"

বিশু ঠাকুর বললেন, "নাঃ!"

অসম্ভব মনের জোর দিয়ে তিনি উঠে বসলেন। কুড়ানিকে বললেন, "গোখরো সাপ কামড়ালে কেউ বাঁচে না। তুই বাঁচলি কী করে রে?"

"ঠাকুরমশাই, আপনিই আমাকে বাঁচিয়েছেন। আমি জানি!"

"কে জানে, আমি বাঁচিয়েছি না ভগবান বাঁচিয়েছেন! কিন্তু বাঁচিয়েই বা কী লাভ হল, এবার তো ক্রীতদাসী হবি!"

"আমরা পালাতে পারব না?"

"ওরে, আমি হাঁটতেই পারছি না, পালাব কী করে? আচ্ছা, দেখি শেষ চেষ্টা করে।"

দাঁড়িয়ে উঠে লাঠি ভর দিয়ে তিনি হাঁটতে লাগলেন আবার। জাহাজের যে দিকটাকে পোর্ট সাইড বলে, তিনি এগোলেন সেই দিকে, খুব আস্তে-আস্তে, দুলতে-দুলতে।

কুড়ানি বলল, "ঠাকুরমশাই, ডাকাতরা ঐদিকেই নেমেছে!"

"দাঁড়া, আগে দেখে নিই, ওরা কতদূরে আছে!"

বিশু ঠাকুর ডেকের কাছে পৌঁছোনো মাত্রই ওদিক থেকে দড়ির সিঁড়ি বেয়ে উঠে এল একজন জলদস্যু। সে এসেছে জাহাজ থেকে কিছু জিনিসপত্র নিয়ে যাবার জন্য। সে প্রথমে বিশু ঠাকুরকে দেখতেই পায়নি। শিস দিতে দিতে উঠে আসছিল। ডেকের ওপরে মুখ বাড়িয়ে বিশু ঠাকুরকে দেখেই সে হঠাৎ ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল, "হোয়া হো! এ গোস্ট!"

বিশু ঠাকুর এক মুহূর্তও চিন্তা করার সময় পেলেন না। তাঁর শরীরে যেন অসুরের শক্তি এসে গেল, তিনি এক লাফে এগিয়ে গিয়ে হাতের বর্শাটা ঘুরিয়ে প্রচণ্ড জোরে মারলেন দস্যুটার মাথায়। সে ঝুপ করে নীচে জলে পড়ে গেল।

বিশু ঠাকুর মুখ ফিরিয়ে বললেন, "কুড়ানি, তুই অজ্ঞানের ভান করে পড়ে থাক। আমি চললাম!"

তিনি দৌড়োলেন উল্টোদিকের ডেকে, স্টারবোর্ডের দিকে।

বিশু ঠাকুরের দুর্ভাগ্য এই যে, জলদস্যু মোটে একজন আসেনি। দড়ির সিঁড়ি বেয়ে আরও তিনজন দস্যু উঠছিল। প্রথমজনকে পড়ে যেতে দেখে বাকি দু'জন একটু থমকে গেল, তারপরই তরতর করে উঠে এল ওপরে।

বিশু ঠাকুর স্টারবোর্ডের রেলিং পর্যন্ত পৌঁছোতে পারলেন না। দস্যুরা পেছন থেকে তাঁকে কচুকাটা করবে বুঝতে পেরে তিনি

ফিরে দাঁড়ালেন। একটু আগে তিনি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলেন না, আর এখন তিনি ঘুরে-ঘুরে লাফিয়ে লাফিয়ে সেই বর্শা হাতে নিয়ে লড়তে লাগলেন তিনজন দস্যুর সঙ্গে। এরই মধ্যে একটা চিন্তা তাঁর মাথায় ঘুরছে। যে-কোনো উপায়েই হোক, এই তিনজন বোম্বেটেকে হারাতেই হবে। তা হলে তিনি উল্টো দিকে জলে লাফিয়ে পড়তে পারবেন।

প্রথম যে দস্যুটি মাথায় আঘাত খেয়ে নীচে পড়ে গিয়েছিল, সে মরেনি। সে জল-কাদার মধ্যে পড়ে থেকেই চিৎকার করতে লাগল, "এ গোস্ট! এ গোস্ট! এ গোস্ট অন বোর্ড, জাহাজের ওপরে একটা ভূত!"

সেই চিৎকার শুনে আরও কয়েকজন দস্যু ধেয়ে এল জাহাজের দিকে।

বিশু ঠাকুর লড়াই করে তিনজনের মধ্যে দু'জনকে যখন মাটিতে শুইয়ে ফেলেছেন, ঠিক সেই সময় জাহাজের ওপরে উঠে এল আরও আট-দশজন দস্যু।

বিশু ঠাকুর হাতের বর্শাটা ওদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে শেষ চেষ্টা করলেন রেলিং টপকে লাফিয়ে পড়বার, তার আগেই তিন-চারজন লাফিয়ে পড়ল তাঁর ঘাড়ের ওপর।

বিশু ঠাকুর যে-ই বুঝলেন যে, এবারও তাঁর পালানো হল না, অমনি তাঁর শরীর থেকে সব শক্তি চলে গেল। মাটিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আবার অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

দস্যুরা তাঁর অচেতন শরীরটার ওপরেই লাথি কষাতে লাগল সবাই মিলে।

একজন তলোয়ার তুলে তাঁর মুণ্ডুটা কেটে ফেলতে গেলে অন্য

একজন দস্যু বাধা দিল। কারণ কাপ্তান গঞ্জালেসকে আগে সব ঘটনাটা জানানো দরকার।

খবর পেয়েই একটু পরে কাপ্তান সিবাস্তিয়ান গঞ্জালেস নিজে দেখতে এল জাহাজে। বিস্ময়ে তার ভুরু কুঁচকে গেল। এই লোকটাকে প্রায় ১৪ ঘণ্টা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে মাথা উল্টো করে। তারপরও এ বেঁচে আছে! শুধু তাই নয়, তারপরও এই লোকটা শুধু একটা বর্শা নিয়ে যুদ্ধ করে তিনজন দস্যুকে ঘায়েল করেছে! ভীরু দুর্বল বাঙালীর এত শক্তি!

গঞ্জালেস বলল, "নাঃ, এ লোকটাকে মারবার দরকার নেই এক্ষুনি। দেখা যাক, ও আরও কতদিন এমন ভাবে বেঁচে থাকতে পারে! বিক্রি করলে ওর জন্য ভাল দাম পেতে পারি, কিংবা ওকে আমাদের দলেও নিয়ে নিতে পারি। তোরা এক কাজ কর, ওকে এই একটা মাস্তলের সঙ্গে বেঁধে রাখ। খাবার কিংবা জল কিছুই দিবি না! ওর যদি জ্ঞান ফেরে, ওকে জিজ্ঞেস করবি, কী রে বাঙালী, আমাদের দলে যোগ দিবি? যদি 'হ্যাঁ' বলে, তা হলে খবর দিবি আমাকে। আর যদি 'না' বলে, তা হলে দশ ঘা করে চাবুক কষাবি! যতবার 'না' বলবে, ততবার দশ ঘা করে চাবুক!"

তাই হল। দস্যুরা বিশু ঠাকুরের অচেতন দেহটা তুলে দাঁড় করিয়ে বেঁধে রাখল একটা মাস্তুল-দণ্ডের সঙ্গে। দড়ির বদলে বাঁধল লোহার শিকল দিয়ে, যাতে আর কিছুতেই খোলা না যায়। দু'জন দস্যুকে পাহারায় রাখা হল সেখানে।

কুড়ানি এর মধ্যে জাহাজের এক কোণে দৌড়ে গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়েছিল অজ্ঞানের ভান করে। ডাকাতরা কেউ তার দিকে নজর করল না।

একবার, দু'বার, তিনবার বিশু ঠাকুর চেষ্টা করেছিলেন দস্যুদের কবল থেকে পালাবার। তিনবারই তিনি ব্যর্থ হলেন। ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের হাতে একবার ধরা পড়লে আর নিস্তার নেই।

সন্ধের পর সব বন্দীদের ফিরিয়ে আনা হল জাহাজে। হঠাৎ দারুণ মেঘ করে বৃষ্টি নামল। সেই বৃষ্টি চলল সারা রাত এবং পরের দিনও।

এই বৃষ্টির মধ্যে গম্বুজ তৈরির কাজ চলে না। তা ছাড়া বৃষ্টির সময় জঙ্গলের বড়-বড় জোঁক বেরোয়। গাছের ডাল থেকে টুপ-টুপ করে জোঁক খসে পড়ে। জোঁক যখন গায়ে লাগে তখন কিছুই বোঝা যায় না, এক সময় দেখা যায়, তারা রক্ত খেয়ে ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। দস্যুরা বাঘের চেয়েও এই জোঁকগুলোকে বেশি ভয় পায়।

আগের দিন গঞ্জালেস তার দলবল দিয়ে তিনটি হরিণ শিকার করেছিল। বৃষ্টির মধ্যে কিছুই করবার নেই বলে তারা সেই হরিণ-গুলোকে পুড়িয়ে মাংস খেল আর বুলেপঞ্জ পান করতে করতে বিকট গলায় দারুণ হৈ-হল্লা করে গান গাইতে লাগল।

জাহাজের খোলের বন্দীরা কিন্তু এক টুকরো মাংসও পেল না। তাদের জন্য শুধু শুকনো রুটি।

সেই দিন এবং রাতেও টানা বৃষ্টি হওয়ায় বিরক্ত হয়ে উঠল কাপ্তেন গঞ্জালেস। কোনো কাজ ছাড়া চুপচাপ এক জায়গায় থেমে থাকা তার একদম পছন্দ নয়। এই সময় আর একটা গ্রাম লুঠ করলে বরং কাজে দিত। কিন্তু এই জাহাজে আর বন্দী নেবার জায়গা নেই। এই বন্দীগুলোকেও আর বেশি দিন বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবার কোনো মানে হয় না।

পরদিন সকালেও বৃষ্টি কমল না দেখে গঞ্জালেস হুকুম দিল জাহাজ ছাড়ার।

এর মধ্যে বিশু ঠাকুরের একবারও জ্ঞান ফেরেনি। দস্যুরা বিনা কারণেই যাওয়া-আসার পথে তার গায়ে দু'এক ঘা করে চাবুক কষিয়েছে, কিন্তু তাতে বিশু ঠাকুর একটু কেঁপেও ওঠেননি।

জাহাজ মোহনা ছেড়ে পড়ল সমুদ্রে। তারপর চলল চট্টগ্রামের দিকে।

কিছুদূর যাবার পরই দূরে দেখা গেল আর-একটা জাহাজ।

দস্যুদের জাহাজের মাস্তুলের ডগায় সব সময় একজন করে লোক চড়ে বসে থাকে। তারা চতুর্দিকে লক্ষ রাখে। সেই লোকটি দূরের অন্য জাহাজটি দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, "হাই হো! হাই হো! স্টার-বোর্ডের দিকে জাহাজ!"

কাপ্তান গঞ্জালেস তখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল। একজন গিয়ে তাকে ডেকে তুলতেই সে ক্যাবিন থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে চোখে দূরবীন লাগিয়ে দেখতে লাগল দূরের জাহাজটিকে।

চিহ্ন দেখে মনে হল, সেটা মগদের জাহাজ। মগদের সঙ্গে বোম্বেটেদের আঁতাত আছে। কিন্তু জলদস্যুরা কারুকেই পুরোপুরি বিশ্বাস করে না। তারা কামান সাজিয়ে তৈরি হয়ে রইল, দস্যুরা ডেকের ওপর সার বেঁধে দাঁড়িয়ে রইল খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে।

একটু কাছে আসবার পর অন্য জাহাজটি উড়িয়ে দিল সাদা পতাকা। এটা বন্ধুত্বের চিহ্ন। শুধু তাই নয়, গঞ্জালেস দূরবীনে দেখতে পেল যে, অন্য জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে আছে আরাকানের মগ রাজার এক ভাই আনাপুরাম। এই আনাপুরামের সঙ্গেই

বোম্বেটেদের ক্রীতদাস-ব্যবসা চলে; কিন্তু আনাপুরাম তো চট্টগ্রাম ছেড়ে এতদূর কখনো আসে না!

দুই জাহাজ এসে লাগল পাশাপাশি। মাঝখানে একটা কাঠের পাটাতন ফেলে দেওয়া হল। তার ওপর দিয়ে আনাপুরাম দস্যুদের জাহাজে চলে আসতেই গঞ্জালেস তাকে সাদরে আলিঙ্গন করে বলল, "ওয়েল কাম, রাজকুমার।"

আনাপুরামও বলল, "তোমায় দেখে খুব খুশি হলাম, প্রিয়বন্ধু, কাপ্তান সিবাস্টিয়ান গঞ্জালেস টিবাও!"

গঞ্জালেসের চেহারা যেমন বিশাল, তেমনি আনাপুরামের চেহারাটি রোগা, পাতলা। কিন্তু তার মাথায় নানারকম মণি-মুক্তো বসানো একটা লম্বা ধাঁচের মুকুট, আর গায়ের লম্বা ঢিলে মখমলের আলখাল্লাটিতে সোনার চুমকি বসানো।

গঞ্জালেস জিজ্ঞেস করল, "রাজকুমার, কী ব্যাপার? আপনি চট্টগ্রাম ছেড়ে এতদূরে এসেছেন যে?"

আনাপুরাম বলল, "আপনি অনেকদিন ক্রীতদাস সরবরাহ করেননি। তাই আপনার খবর নিতে এলাম!"

গঞ্জালেস হো-হো করে হেসে বলল, "আমার জাহাজ ভর্তি দাস-দাসী। আমি নিজেই তো আপনাকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত পৌঁছে দিতে যাচ্ছিলাম!"

আনাপুরাম একটু গম্ভীর হয়ে বলল, "আমি ভাবছি, এবার দাস-দাসীগুলোকে সিংহলের বাজারে বিক্রি করব। ওখানে ভাল দাম পাওয়া যায়!"

গঞ্জালেস একটু অবাক হল। আরাকান রাজ্যেই প্রচুর ক্রীত-দাসের চাহিদা আছে। আরাকানের রাজা সব সময়ই বোম্বেটেদের

বলেন, আরও দাস-দাসী পাঠাও। আর এখন আনাপুরাম চাইছে সিংহলে দাস-দাসী বিক্রি করতে!

আনাপুরাম বলল, "চলুন, আগে দাস-দাসীদের দেখে আসি। তারপর আপনার সঙ্গে আমার অন্য একটা জরুরি কথা আছে। আপনি অনেকবার আমাকে অনেক বিপদে সাহায্য করেছেন, আপনাকে আর-একবার সাহায্য করতে হবে!"

গঞ্জালেস বলল, "নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই!"

দু'জনে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল জাহাজের খোলে। সঙ্গে এল দু'পক্ষের আরও কয়েকজন। শেকলে বন্দীরা সব সার দিয়ে বসে আছে। তাদের কারুর শোওয়ার উপায় নেই, তাই বসে বসেই ঘুমোচ্ছে অনেকে।

যদিও দুপুরবেলা, খোলের মধ্যে যথেষ্ট আলো আছে, তবু দু'জন দস্যু মশাল জ্বালিয়ে নিয়ে এল। এই লোকগুলোর মধ্যে কেউ কানা-খোঁড়া কি না দেখতে হবে।

গঞ্জালেসের হুকুমে উঠে দাঁড়াল সব বন্দীরা। আনাপুরামের একজন সহচর প্রত্যেকের গা-হাত-পা টিপে টিপে দেখতে লাগল। আর বিড়বিড় করে বলতে লাগল, "বেশির ভাগেরই স্বাস্থ্য ভাল না, বাজে মাল, বাজারে ভাল দাম পাওয়া যাবে না!"

অর্থাৎ দাম কমাবার চেষ্টা। এখুনি দরাদরি শুরু হবে।

দু'জন মাত্র বন্দীকে পছন্দ হল না আনাপুরামের। ওদের বয়েস বড্ড বেশি, কোনো খদ্দের ওদের নেবে না।

গঞ্জালেস তার এক অনুচরের দিকে তাকিয়ে চোখের ইঙ্গিত করল। অর্থাৎ একটু পরে ঐ বুড়ো দু'জনকে মেরে জলে ফেলে দিলেই হবে!

দরদাম হল বেশ কিছুক্ষণ ধরে। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, যারা বেশ জোয়ান পুরুষ ও যুবতী মেয়ে, তাদের প্রত্যেকের দাম ৩৫ স্বর্ণমুদ্রা, একটু বেশি-বয়সীদের দাম ২৫ আর ছোটদের দাম ২০। কুড়ানি বুদ্ধি করে এক ফাঁকে এই বন্দীদের মধ্যে এসে মিশে ছিল, তাই সে-ও বিক্রি হয়ে গেল ২০টি স্বর্ণমুদ্রায়।

এবার আনাপুরাম উঠে এল ওপরে। হঠাৎ মাস্তুলে বাঁধা বিশু ঠাকুরের দিকে তার চোখ পড়ল।

গঞ্জালেসকে সে জিজ্ঞেস করল, "এই লোকটা এখানে কেন?"

গঞ্জালেস হাসতে-হাসতে বলল, "এ এক বিচিত্র জীব! এর ওপর যা অত্যাচার করা হয়েছে, তাতে এর অন্তত তিনবার মরে যাবার কথা! কিন্তু এমন কড়া জান, এখনো বেঁচে আছে। ছাখো, প্রায় দু' দিন ধরে ওকে এখানে বেঁধে রাখা হয়েছে, খাবার কিংবা জল কিছুই দেওয়া হয়নি, তবু এখনো বেঁচে আছে। জ্ঞান নেই, কিন্তু নাক দিয়ে নিশ্বাস পড়ছে।"

আনাপুরাম বলল, "আশ্চর্য! তবে শুনেছি, অনেক ভারতীয় যোগী এরকম পারে! দিনের পর দিন না খেয়ে বেঁচে থাকে!"

গঞ্জালেস বলল, "লোকটা একটা মন্দিরে পুজো করত। হতেও পারে কোনো যোগী। ভাবছি, ওকে আমার দলে নিয়ে নেব! তবে রাজী হবে কি না সন্দেহ! এক-একটা বাঙালী থাকে এমন গোঁয়ার যে, কিছুতেই কথা শোনে না!"

আনাপুরাম বলল, "ওদের বশ করা খুব সোজা! মন্দিরে যখন পুজো করত, তখন নিশ্চয়ই ও লোকটা ব্রাহ্মণ! ওর জ্ঞান ফিরলে, ওর মুখে এক টুকরো গরুর মাংস গুঁজে দেবে জোর করে। তাতেই ওর জাত যাবে। জাত চলে যাবার পর, তুমি যা বলবে, তাই শুনবে।

আমরা তো সব ক্রীতদাসদের নিয়ে প্রথমে তাই করি।"

গঞ্জালেস বলল, "তাই নাকি! ঠিক আছে, ওর জ্ঞান ফিরলে চেষ্টা করা যাবে।"

গঞ্জালেস ঠাঁই করে বিশু ঠাকুরের ঝুলে পড়া মুখে একটা চড় কষাল। সে দেখতে চাইল, বিশু ঠাকুরের জ্ঞান ফিরেছে কিনা, কিন্তু বিশু ঠাকুরের শরীর একটুও কাঁপল না।

আনাপুরাম বলল, "এ-রকম শক্তিশালী লোকদের নিয়ে আমাদের এখন দল ভারী করা দরকার! কাপ্তান গঞ্জালেস, আপনি শুনেছেন কি যে, মোগল সেনাপতি শায়েস্তা খাঁ বিরাট সৈন্যবাহিনী এনেছেন? তিনি এবার চট্টগ্রাম জয় করতে চলেছেন।"

গঞ্জালেস চমকে উঠে বললেন, "শায়েস্তা খাঁ? তার নাম শুনেছি। সে এখন এদিকে?"

আনাপুরাম বলল, "হ্যাঁ! এর মধ্যে তিনি চট্টগ্রাম জয় করে ফেলেছেন কি না কে জানে! আপনাদের সন্দ্বীপও তিনি দখল করবেন! তারপর হানা দেবেন আরাকান রাজ্যে! এ একেবারে পাকা খবর!"

গঞ্জালেস চিন্তিত মুখে চুপ করে রইল। বেশির ভাগ দস্যুদেরই বৌ-ছেলে-মেয়ে আছে সন্দ্বীপে। মোগলরা একবার সন্দ্বীপ দখল করলে তাদের ওপর নিশ্চয়ই দারুণ অত্যাচার চালাবে! এ খবর শুনলে তার সঙ্গীদের অনেকেরই মন ভেঙে পড়বে, সুতরাং এ-সব খবর এখন গোপন রাখা দরকার।

গঞ্জালেস মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল, "মোগলরা জলে যুদ্ধ করতে সাহস করবে না। সন্দ্বীপ দখল করতে হলে জলপথে যেতে হবে।"

আনাপুরাম বলল, "মোগলরা এবার শক্তিশালী যুদ্ধ-জাহাজ

এনেছে। যাই হোক, এ-সব বিষয়ে আপনার সঙ্গে পরে আলোচনা করব। ক্রীতদাসদের আমার জাহাজে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন। আর এই লোকটাকেও আমার চাই।"

আনাপুরাম বিশু ঠাকুরের দিকে আঙুল তুলে দেখাতেই গঞ্জালেস বলল, "নাঃ, এ লোকটাকে আমি বিক্রি করব না। আমি ওকে শেষ পর্যন্ত দেখতে চাই!"

আনাপুরাম বলল, "এমন স্বাস্থ্য বাঙালীদের মধ্যে খুব কম দেখা যায়, তা ছাড়া ওর কথা যা শুনলাম, তাতে ওরকম একটি তেজী লোক আমার খুব দরকার।"

গঞ্জালেস বলল, "বললাম তো, ওকে আমি বিক্রি করব না!"

আলখাল্লার পকেট থেকে একটা টাকা-ভর্তি থলে বার করে আনাপুরাম বলল, "ওর জন্য আমি একশো স্বর্ণমুদ্রা দেব!"

গঞ্জালেসের মুখখানা একেবারে হাঁ হয়ে গেল। লোকটা বলে কী? এ পর্যন্ত পঞ্চাশ স্বর্ণমুদ্রার বেশি কোনো দাসের দাম ওঠেনি, আর এই অজ্ঞান মানুষটা, বেশিক্ষণ আর বাঁচবে কি না সন্দেহ, তার জন্য দাম দিতে চায় একশো স্বর্ণমুদ্রা!

কাঁধ ঝাঁকিয়ে গঞ্জালেস বলল, "ঠিক আছে। নিন তবে, এতই যখন আপনার ইচ্ছে!"

কাপ্তানের ইঙ্গিতে একজন দস্যু বিশু ঠাকুরের হাত-পায়ের শেকল খুলে দিল। বিশু ঠাকুর লম্বা হয়ে ঠিক একটা আলগা পাথরের মূর্তির মতন পড়ে গেলেন ডেকের ওপর।

পর মুহূর্তেই একটা দারুণ অদ্ভুত ব্যাপার হল। ঠিক যেন অলৌকিক কাণ্ড!

এই দু' দিনে বিশু ঠাকুরের একটুও জ্ঞান ফেরেনি, একবারও

চোখের পলক পড়েনি। খাদ্য-পানীয় কিছুই দেওয়া হয়নি তাঁকে তিনি ঠিক মড়ার মতন বাঁধা অবস্থায় ঝুলে ছিলেন।

এখন শিকল খুলে দেবার পর মেঝেতে পড়ে যাবার ঠিক সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি তড়াক করে আবার দাঁড়িয়ে উঠলেন। কেউ কিছু বোঝবার আগেই তিনি সামনের দু'জন দস্যুকে ধাক্কা দিয়ে ছিটকে ফেলে দিয়ে ছুটে গেলেন পোর্ট সাইডের রেলিংয়ের দিকে।

সবাই এমন হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল যে, প্রথমটায় কেউ ঠিক-মতন ব্যাপারটা বুঝতেই পারেনি। তারপর অনেকেই ভয় পেয়ে মাটিতে বসে পড়ে 'ভূত ভূত' বলতে-বলতে বুকে-কপালে ক্রশ-চিহ্ন আঁকতে লাগল। আনাপুরাম দৌড়ে গিয়ে লুকোল একটা থামের আড়ালে। গঞ্জালেস আর কয়েকজন দস্যু তাড়া করে গেল বিশু ঠাকুরকে।

বিশু ঠাকুর ততক্ষণে রেলিংয়ের ওপর উঠে দাঁড়িয়েছেন। একবার পেছন ফিরে দস্যুদের দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে তিনি ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন সমুদ্রে।

গঞ্জালেস তার পিস্তল দিয়ে গুলি করবার চেষ্টা করল, কয়েক-জন দস্যু বর্শা ছুঁড়ে মারবার চেষ্টা করল বিশু ঠাকুরকে। কিন্তু তাঁকে আর দেখা গেল না, লাফাবার সঙ্গে-সঙ্গেই তিনি জলের নীচে তলিয়ে গেছেন!

গঞ্জালেস মুখ বাঁকিয়ে বলল, "বোকা গোঁয়ারটা মরুক! জলে ডুবেই মরুক। হাঙর-কুমিরে ওকে ছিঁড়ে খাক! এবার ওকে বাঁচানো ওদের তেত্রিশ কোটি দেবতারও অসাধ্য।"

॥ ৭ ॥

এই ঘটনার পর আনাপুরামের সঙ্গে গঞ্জালেসের সামান্য কথা-কাটাকাটি হল।

প্রশ্ন উঠল—বিশু ঠাকুরের দাম নিয়ে। আনাপুরাম বলল যে, গঞ্জালেস তাকে একটা দানোয়-পাওয়া মড়া-মানুষ গছিয়ে দেবার চেষ্টা করছিল, সুতরাং ওর জন্য দাম সে দেবে না!

আর গঞ্জালেস বলল, আনাপুরামের কথাতেই ওর হাত-পায়ের শিকল খুলে দেওয়া হল, নইলে ও পালাতে পারত না। সুতরাং ওর দাম দিতে হবে ঐ আনাপুরামকেই। এবং একশো স্বর্ণমুদ্রা, তার চেয়ে এক কানাকড়ি কম হলে চলবে না।

দু'জনেই যখন বেশ গরম হয়ে উঠেছে, তখন আনাপুরাম হঠাৎ স্বর্ণমুদ্রা ভর্তি একটা থলে গঞ্জালেসের কোলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বলল, "আরে বন্ধু, এই সামান্য টাকার জন্য আমরা বিবাদ করছি! বললাম না, আপনার কাছে আমার অনেক সাহায্যের দরকার হবে! যা হয়েছে, ভুলে যান!"

দু'জনে আবার করমর্দন করল।

এবার ভোজের পালা।

নিয়ম হল, দাস-দাসী বিক্রির দিনে যারা কিনবে, তাদের বিরাট ভোজ খাওয়াতে হবে। ক্রেতারা এত টাকা খরচ করছে, তার বিনিময়ে তারা কিছু খাতির-যত্ন পাবে না?

সুতরাং আনাপুরামের জাহাজের সমস্ত লোকের আজ নেমন্তন্ন

গঞ্জালেসের জাহাজে।

ডেকের ওপর কয়েকটা টেবিল পাতা হল। একটি টেবিলে শুধু গঞ্জালেস আর আনাপুরাম। আর-একটা টেবিলে বসবে আনাপুরামের ছ'জন খুব বিশ্বাসী অনুচর আর গঞ্জালেসের ছ'জন অনুচর। আর একটা খুব বড় টেবিলে খাবার সাজানো থাকবে, তার ছু'দিকে দাঁড়িয়ে ছু' জাহাজের লোকেরা খাবার তুলে-তুলে নিয়ে খাবে!

জলদস্যুদের জাহাজে সব সময় প্রচুর খাবার মজুত থাকে। কতদিন তাদের জলে ভেসে থাকতে হবে, তার তো ঠিক নেই, সেইজন্য খাবারের ব্যবস্থা তারা আগেই করে রাখে। সুতরাং হঠাৎ ছু'-এক শো লোককে নেমন্তন্ন খাওয়াতে তাদের অসুবিধে হয় না। আনা-পুরামের জাহাজে লোকজনের সংখ্যা মাত্র একশো দশ।

মাঝখানে ছু' ঘণ্টা সময় নেওয়া হল খাবার-দাবার তৈরি করার জন্য। জলদস্যুদের খাবার সময়েরও কোনো ঠিক নেই। সূর্য যখন সমুদ্রের এক দিকে অস্ত যাচ্ছে, ঠিক সেই সময় সকলে বসল ছুপুরের ভোজ খেতে।

ছুটি পাত্রে খানিকটা করে সিরাজি ঢেলে একটি আনাপুরামের দিকে এগিয়ে দিয়ে গঞ্জালেস বলল, "আসুন, আপনার সৌভাগ্য-কামনায় আমরা এই সিরাজি পান করি।"

সিরাজি অতি উগ্র পানীয়। এ শুধু হিন্দুস্থানেই পাওয়া যায়, আরাকানে পাওয়া যায় না। অতিথিদের প্রতি বিশেষ সম্মান দেখাবার জন্যই গঞ্জালেস এই সিরাজি পরিবেশন করেছে।

আনাপুরাম নিজের পাত্রে একটা চুমুক দিয়ে বলল, "আর আমার সৌভাগ্য! আমার সৌভাগ্য তো সব এখন আপনার ওপর

নির্ভর করছে !”

গঞ্জালেস বলল, “কেন, কেন ? আপনি আরাকানের যুবরাজ ! আপনার দাদার পরে আপনিই হবেন আরাকানের রাজা ! আপনার তুলনায় আমি তো অতি সামান্য লোক !”

আনাপুরাম গলার আওয়াজ নিচু করে বলল, “বন্ধু, আরাকানে আমার ফেরার পথ বন্ধ ! সেইজন্যই তো আপনার সাহায্য চাই !”

গঞ্জালেস চমকে গিয়ে বলল, “কেন ? ফেরার পথ বন্ধ কেন ?”

আনাপুরাম বলল, “আমি আমার দাদার ছেলেকে খুন করেছি। সে অতি অবাধ্য, বদমাশ, পাজি, অসভ্য ছেলে ছিল। সে সব সময় গর্ব করে বলত যে, আমার দাদার পরে সে-ই রাজা হবে। তাই আমি আর সহ্য করতে পারিনি। একদিন তার খাবারের মধ্যে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলাম !”

গঞ্জালেস এক গাল হেসে বলল, “বাঃ, বেশ করেছেন ! সে অতি বদমাশ তো বটেই ! তাকে খুন করাই উচিত !”

আনাপুরাম বলল, “কিন্তু আমার দাদা টের পেয়ে গেছেন। তিনি অত্যন্ত রেগে গিয়ে আমাকে হত্যা করার জন্য সেনাবাহিনীকে আদেশ দিয়েছেন। আমি তাই ধনরত্ন যা পেয়েছি, সব নিয়ে পালিয়ে এসেছি। এখন আপনার কাছে আমার আরজি এই যে, আপনি এদিকে কোথাও, সুন্দরবনের মধ্যে আমার থাকার একটা ব্যবস্থা করে দিন। আমার কাছে ধনরত্ন যা আছে, তা দিয়ে আমি একটা নতুন নগর পত্তন করতে পারব। কিন্তু সেজন্য আপনার সাহায্য দরকার। এখন থেকে আমি সিংহলের বাজারে দাস-ব্যবসা চালাব।”

গঞ্জালেস বলল, “বাঃ, বেশ ভাল কথা। আমি নিশ্চয়ই আপনাকে সাহায্য করব !”
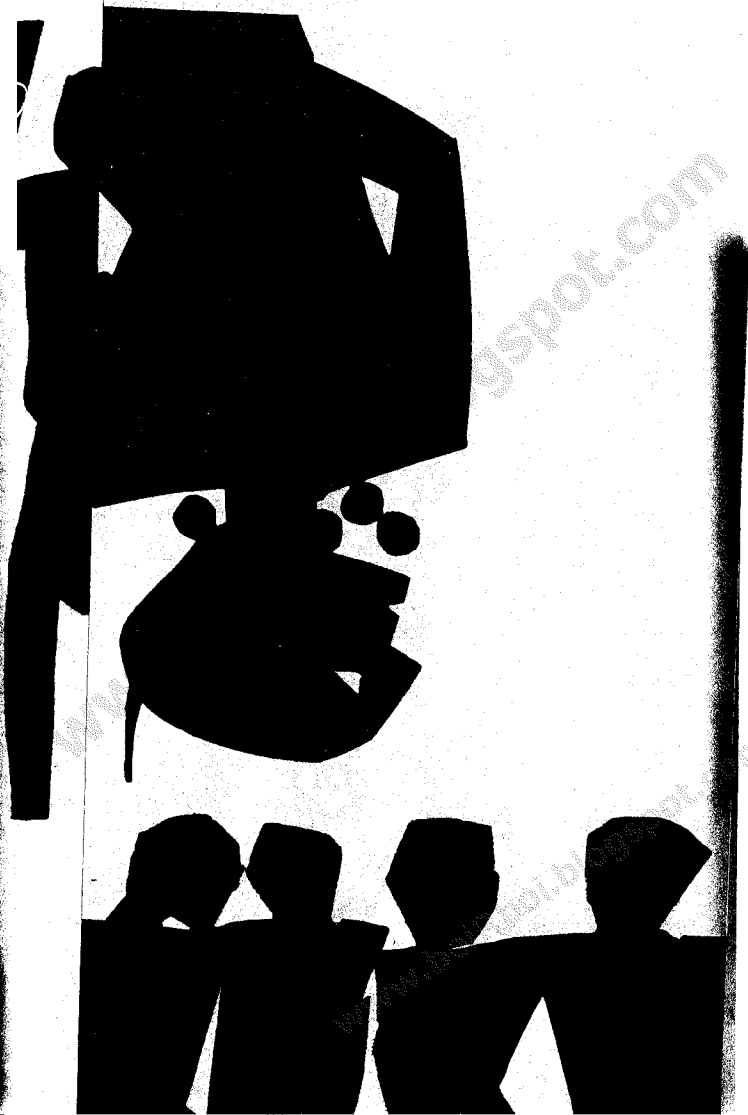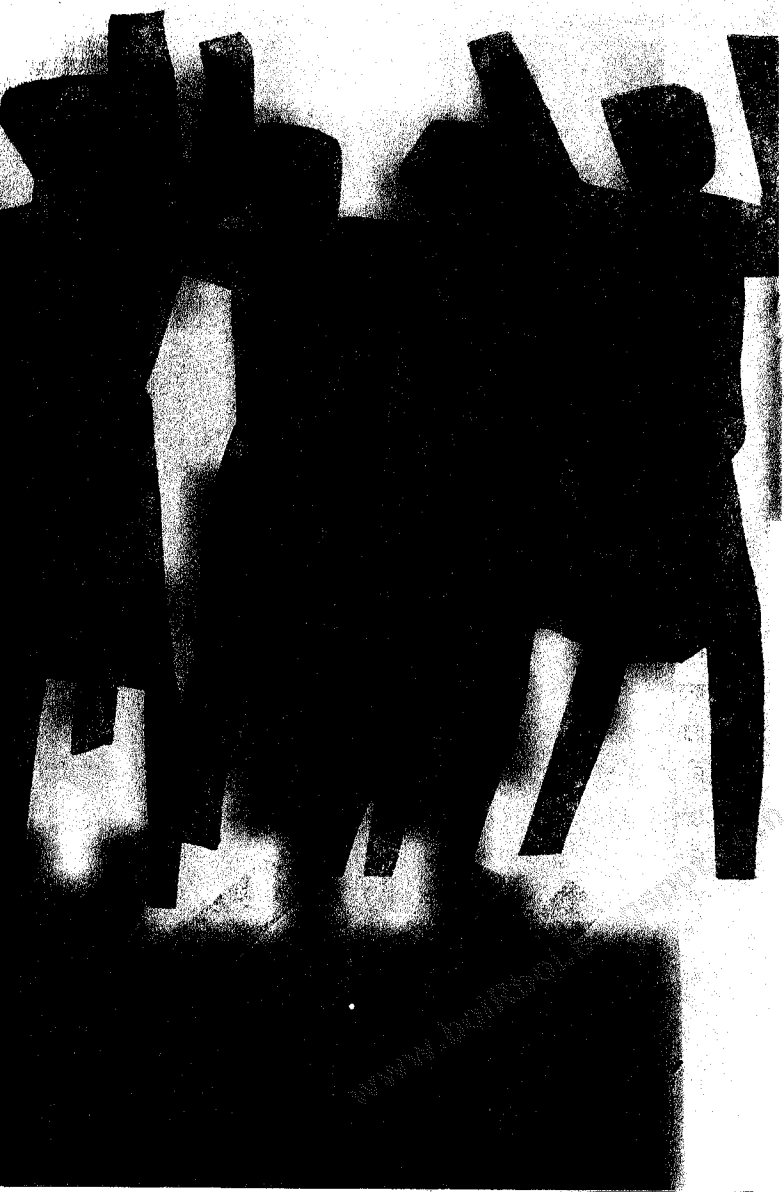
আনাপুরাম বলল, "আসলে আমরা দু'জনেই দু'জনকে সাহায্য করব।"

"তার মানে?"

"আমি শুনেছি, শায়েস্তা খাঁ হুকুম দিয়েছেন যে সমস্ত জলদস্যুদের আত্মসমর্পণ করতে হবে তাঁর কাছে, তাহলে তিনি তাদের ক্ষমা করতে পারেন। আপনি কি আত্মসমর্পণ করতে চান?"

"সিবাস্তিয়ান গঞ্জালেস টিবাও কখনো কারুর কাছে মাথা নিচু করে না। দেহের শেষ বিন্দু রক্ত থাকতে আমি কখনো ধরা দেব না!"

"তা হলে? এবার মোগলরা যত সৈন্য এবং যত জাহাজ এনেছে তার সঙ্গে যুদ্ধ করার সামর্থ্য আপনাদের নেই। হয়তো এর মধ্যে চট্টগ্রামের পতন হয়ে গেছে। সন্দীপও মোগলের দখলে যাবেই। সুতরাং ওদিকে আপনাদের ফেরার পথ একেবারে বন্ধ। মোগলরা আরাকানও আক্রমণ করবে। তবে, আমার দাদা যদি মোগলদের সঙ্গে সন্ধি করেন, তা হলে তিনি বেঁচে যেতে পারেন। দাদার সঙ্গে ঝগড়া না করলে আমিও বেঁচে যেতাম আর আরাকানে থাকতেও পারতাম। সেইজন্যই বলছি, আপনাকেও লুকিয়ে থাকতে হবে। সুতরাং আমাদের দু'জনের মিলিত শক্তি নিয়ে এক জায়গায় থাকাই ভাল নয় কি? আমি শুনেছি, সুন্দরবন অঞ্চল লুকিয়ে থাকবার পক্ষে খুব ভাল জায়গা!"

গঞ্জালেস চুপ করে রইল।

আনাপুরাম একটু বাঁকা হেসে বলল, "কী কাপ্তানসাহাব, সন্দীপে আর ফিরতে পারবেন না শুনে মন খারাপ হয়ে গেল নাকি?"

গঞ্জালেস গম্ভীর ভাবে বলল, "এসব কথা আমার লোকজনদের

কাছে এখন কিছু বলবার দরকার নেই। তারা যেন কিছু না শুনতে পায়।”

“তাদের বৌ-ছেলেমেয়ে মোগলদের হাতে ধরা পড়েছে শুনলে তাদের মন খারাপ হয়ে যাবে! আপনার স্ত্রীও তো সন্দ্বীপে আছে?”

“হ্যাঁ!”

“আপনিও কি আপনায় স্ত্রীর জন্য মন খারাপ করবেন নাকি? আপনাকে যদি আমি আরও একটি সুন্দরী স্ত্রী জুটিয়ে দিই? আমার জাহাজে আছে আমার ছোট বোন, সে-ও আমার সঙ্গে পালিয়ে এসেছে। আমি প্রস্তাব দিতে চাই, আপনি আমার বোনকে বিয়ে করুন। আপনি তাকে দেখেননি, সে অতি সুন্দরী!”

গঞ্জালেস শুকনো ভাবে হেসে বলল, “আপনার বোন একজন রাজকুমারী, তাঁকে বিয়ে করা তো আমার পক্ষে অতি সৌভাগ্যের ব্যাপার! কিন্তু তিনি কি আমায় বিয়ে করতে রাজী হবেন?”

আনাপুরাম টেবিলে এক চাপড় মেরে বলল, “আমি বললেই সে রাজী হবে! তা ছাড়া আপনার মতন একজন বীরপুরুষকে কোন্ মেয়ে না বিয়ে করতে চাইবে!”

এমন সময় কথাবার্তায় বাধা পড়ল। জাহাজের সব লোক ভোজে যোগ দিলেও মাস্তুলের ডগায় একজন ঠিক পাহারা দেবার জন্য বসে থাকেই। সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, “হেই হো। হেই হো! জাহাজ! স্টারবোর্ডের দিকে জাহাজ! একটা নয়, দুটো!”

আনাপুরামের মুখখানা ভয়ে চুপসে গেল। সে বলল, “সর্বনাশ। নিশ্চয়ই মোগলদের জাহাজ! আর রক্ষে নেই!”

গঞ্জালেস দৌড়ে নিজের ক্যাবিন থেকে দূরবীনটা নিয়ে এল।

সন্ধে হয়ে এসেছে। বেশি দূরের কিছু দেখা যায় না।

আনাপুরাম বলল, "আমাদের এখন সিংহলের দিকে পালাতে হবে! যে-কোনো উপায়েই হোক!"

ঠিক তক্ষুনি দূরের জাহাজ থেকে একটা কামানের গর্জন শোনা গেল।

আনাপুরাম ব্যস্ত হয়ে বলল, "সব পাল তুলে দিতে বলুন! ভোজ এখন বন্ধ রাখতে বলুন।"

গঞ্জালেস বিরক্ত হয়ে বলল, "চুপ করুন! একটু চুপ করুন!"

আবার দূরের জাহাজ থেকে পর পর দু'বার কামানের আওয়াজ শোনা গেল। একটু থেমে আবার পর পর তিনবার!

এবার গঞ্জালেসের সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে পড়ল। সে আবার খাবার টেবিলে বসে পড়ে বলল, "আসুন, সিরাজি পান করা যাক। এমন ভোজ নষ্ট করার তো কোনো মানে হয় না!"

আনাপুরাম ঘাবড়ে গিয়ে বলল, "সে কী! আপনি তা বলে মোগলদের হাতে সত্যিই ধরা দিতে চান?"

গঞ্জালেস সগর্বে উত্তর দিল, "তোমাকে একটু আগেই বললাম না, আমি মৃত্যুবরণ করব, তবু কখনো ধরা দেব না! ভয়ের কিছু নেই, ঐ জাহাজ নিয়ে আসছে আমার ভাই!"

"কী করে বুঝলেন?"

"বোঝার উপায় আছে!"

গঞ্জালেসের জাহাজের যেদিকে আনাপুরামের জাহাজ লেগেছিল, তার উল্টোদিকে এসে ভিড়ল ওর ভাইয়ের জাহাজ। গঞ্জালেসের টেবিলে আর-একটা চেয়ার দেওয়া হল, তার ভাই ডিয়েগো সেখানে এসে ভোজে যোগ দেবে।

ডিয়েগো সদলবলে লাফিয়ে এল এই জাহাজে। ডিয়েগো তার দাদাকে আলিঙ্গন করল। আনাপুরামের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল অনেকবার। টেবিল থেকে সিরাজির বোতলটা তুলে এক চুমুকে সবটা শেষ করে ফেলল সে। তারপর বলল, "তোমরা খানাপিনা চালাও, আমি একটু হাত-মুখ ধুয়ে আসি।"

যাবার সময় সে দাদার দিকে চোখ টিপে কিছু একটা ইশারা করে গেল!

গঞ্জালেস আনাপুরামকে বলল, "দেখলেন তো, ছেলেটা সব সিরাজি শেষ করে গেল! দাঁড়ান, আর-একটা বোতল নিয়ে আসি।"

গঞ্জালেস নিজের ক্যাবিনে এসে দেখল, সেখানে ডিয়েগো চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

গঞ্জালেস তাকে জিজ্ঞেস করল, "কী রে, খবর কী?"

ডিয়েগো উৎফুল্ল মুখে বলল, "দুটো মোগল জাহাজকে খতম করে এসেছি!"

"তার মানে? কখন? কোথায়?"

ডিয়েগো রায়মঙ্গল নদীর সব ঘটনাটা খুলে বলল।

শুনতে শুনতে গঞ্জালেসের মুখখানা উৎকট গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর চাপা রাগে হিসহিস করে বলল, "নির্বোধ, গোঁয়ার! করেছিস কী? সাধ করে কেউ বাঘের গুহায় আঘাত হানতে যায়?"

মোগলদের কাছ থেকে যখন পালিয়ে আসার সুযোগ ছিল, তখন বিনা কারণে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গেছে কেন ডিয়েগো? জলদস্যুদের নিয়মই এই যে, একেবারে মুখোমুখি ধরা না পড়লে

তারা রাজশক্তির সঙ্গে কক্ষনো লড়াই করতে যায় না। মোগলদের দুটি জাহাজ ডুবেছে, একজন মোগল সেনাপতি মারা গেছে, এবার তো মোগলরা প্রতিশোধ নেবার জন্য পাগল হয়ে উঠবে!

গঞ্জালেস দ্রুত চিন্তা করতে লাগল। চট্টগ্রাম-সন্দ্বীপের দিকে ফেরা যাবে না। এখানকার নদীপথেও আর বেশিদিন থাকবার উপায় নেই, চট্টগ্রাম জয় করার পর এদিকে এসে মোগলরা তাদের খুঁজে বার করবেই। একমাত্র উপায় কয়েকটি দিন একেবারে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকা। একেবারে চুপচাপ। তারপর গোয়ার দিকে পালিয়ে যেতে হবে। গোয়ায় পর্তুগীজ রাজত্ব চলছে, সেখানে পৌঁছতে পারলে আর বিপদ নেই।

লুকিয়ে থাকার পক্ষে সবচেয়ে ভাল জায়গা হল, নদীর মোহনায় যেখানে গম্বুজটা তৈরি হচ্ছে, সেই অঞ্চলটা। কাছে সমুদ্র, মোগলরা তাড়া করলেই সমুদ্রে ভেসে পড়া যাবে। তবে, একসঙ্গে বেশি লোকজন নিয়ে লুকিয়ে থাকার অনেক ঝামেলা আছে।

অতি কষ্টে রাগ দমন করে গঞ্জালেস ডিয়েগোর পিঠে কয়েকটা চাপড় দিয়ে স্নেহের সুরে বলল, "যা করেছিস, বেশ করেছিস! তোর বড্ড বেশি সাহস, একদিন এর জন্য বিপদে পড়বি! এবার কয়েকটা কথা মন দিয়ে শোন!"

ডিয়েগোর কানে কানে ফিসফিস করে গঞ্জালেস কিছু বলল। তারপর একটা সিরাজি-বোতল নিয়ে ফিরে এল খাওয়ার টেবিলে।

হাসি-ঝলমল মুখে সে আনাপুরামকে বলল, "আমার ভাই দারুণ সুসংবাদ এনেছে। আজ বড় আনন্দের দিন। আজ জাহাজসুদ্ধ সকলকে সিরাজি পান করানো হবে।"

আনাপুরাম অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "কিসের সুসংবাদ?

আমি তো কয়েকদিন ধরে অনবরত খারাপ খবর শুনে আসছি!”

‘বলব! বলব! আপনাকে সবই বলব! আপনি আমি তো এখন একই সংসারের লোক! আগে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে নেওয়া যাক! এই নিন, গরম-গরম ঝলসানো মাংস!”

“আমি তো মাংস খাই না!”

“সিরাজি পান করেন, অথচ মাংস খান না? হা-হা-হা-হা! আপনারা বড় অদ্ভুত মানুষ! তাহলে ফলমূল খান। বাটাভিয়ার বড়-বড় লেবু আছে, বাংলার ছোট-ছোট মিষ্টি কলা আছে, কাঁচা পেঁপেসেদ্ধ আছে, আরও অনেক কিছু আছে। আপনার যেটা খুশি খান। আর একটু সিরাজি পান করবেন নিশ্চয়ই?”

আনাপুরামের এর মধ্যেই একটু-একটু নেশা হয়েছে। সে জড়ানো গলায় বলল, “হ্যাঁ দিন, সিরাজি দিন, আপনার ভাই সুসংবাদ এনেছে!”

আনাপুরাম যখন নুন দিয়ে কাঁচা পেঁপেসেদ্ধ খাচ্ছে তখন তার পাত্রে সিরাজি ঢালার সময় গঞ্জালেস খুব গোপনে তার একটা আংটির মধ্যে বসানো মুক্তোটা একটু ঘুরিয়ে দিল। সেই মুক্তোর তলায় আছে একটা ছোট্ট কৌটো, তার মধ্যে থাকে অতি উগ্র বিষ। সেই বিষটুকু গঞ্জালেস মিশিয়ে দিল আনাপুরামের সিরাজির মধ্যে।

তারপর সে উল্লাসের সঙ্গে বলল, “আসুন রাজকুমার, এই পাত্রটা এক চুমুকে শেষ করা যাক্।”

চুমুক শেষ হবার আগেই আনাপুরামের হাত থেকে খসে পড়ল সিরাজির পাত্রটা। মুখখানা তার নীল হয়ে গেছে। দু’ হাতে বুক চেপে ধরে সে বলল, “কী হল? বুক জ্বলে যাচ্ছে! আমার

বুক জ্বলে যাচ্ছে!"

গঞ্জালেস হাসিমুখে চেয়ে রইল তার দিকে।

উঠে দাঁড়াতে গিয়েও আনাপুরাম ধপাস করে পড়ে গেল টেবিলের ওপর। ছটফট করতে করতে কোনো রকমে বলল, "গঞ্জালেস··· আমায় বাঁচান, আমি মরে যাচ্ছি··· আমায় বাঁচান··· যত টাকা লাগে দেব!"

গঞ্জালেস বলল, "তলোয়ারের এক কোপেই তোর মুণ্ডুটা আমি কেটে ফেলতাম, নরকের কুকুর! কিন্তু তোর দাদার ছেলেকে তুই যে-ভাবে মেরেছিস, তোর মরণও ঠিক সেইভাবে হওয়াই ভাল।"

আনাপুরাম আর কোনো কথা বলতে পারল না। কয়েকবার ঝাঁকুনি দিয়েই তার প্রাণটা শরীর ছেড়ে চলে গেল।

গঞ্জালেস টেবিলের এদিকে এসে আনাপুরামের মৃতদেহটা দু' হাতে উঁচু করে তুলল মাথার ওপরে। তারপর বিকট গলায় চিৎকার করে উঠল, "আহোয়! আহোয়!"

সবাই চমকে তাকাল সেদিকে। এতক্ষণ সবাই খাদ্য-পানীয় নিয়ে ব্যস্ত ছিল, কেউ এদিকে কী হচ্ছে লক্ষই করেনি।

গঞ্জালেস আনাপুরামের মৃতদেহটা জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হুকুম দিল, "মগ্ কুত্তাগুলোকে শেষ করে দে!"

সঙ্গে-সঙ্গে ডিয়েগো তার দস্যুবাহিনী নিয়ে আড়াল থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল আনাপুরামের অনুচরদের ওপর। তারা একটুও প্রস্তুত ছিল না, রুখে দাঁড়াবার আগেই কচুকাটা হয়ে গেল অনেকে। খাবার-দাবার সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। গোটা জাহাজটার ওপর শুরু হল খণ্ডযুদ্ধ।

গঞ্জালেস নিজেও এগিয়ে এল তলোয়ার নিয়ে। তার সামনে

দাঁড়াবার সাধ্য কারুর নেই। মানুষ মারায় তার দারুণ আনন্দ। এক-এক কোপে সে মাথা কেটে ফেলল এক-একজন মরা সৈন্যের।

প্রায় এক ঘণ্টা যুদ্ধে মগ্‌ সৈন্যরা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। কিছু মগ্‌ সৈন্য নিজেদের জাহাজে ফিরে গিয়ে লুকোবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু ফিরিঙ্গি বোম্বেটেরা তাদের একজনকেও প্রাণে বাঁচিয়ে রাখল না। মৃতদেহগুলোকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল জলে। ফিরিঙ্গিদেরও বারোজন দস্যু নিহত হয়েছে, তাদেরও সলিল-সমাধি হল।

যুদ্ধ-জয়ের পর ডিয়েগো আবার এসে আলিঙ্গন করল গঞ্জালেসকে। আজ সত্যিই একটা আনন্দের দিন। ক্রীতদাস-দাসীগুলো হাতে রয়েই গেল, অথচ তাদের জন্য দাম আদায় করে নেওয়া হয়েছে আনাপুরামের কাছ থেকে। ওদের আবার বিক্রি করা যাবে।

তাছাড়া আনাপুরামের জাহাজ-ভর্তি প্রচুর ধনরত্ন, সে-কথা সে নিজের মুখেই স্বীকার করেছে। সে-সবও ভাগাভাগি করে নেওয়া যাবে।

হাতের রক্ত ধুয়ে-টুয়ে ফেলে দস্যুরা আবার খাবার খেতে বসে গেল। গঞ্জালেস নিজের হাতে করে তার নিজের এবং ডিয়েগোর জাহাজের দস্যুদের প্রত্যেককে একশোটি স্বর্ণমুদ্রা দিল। আনাপুরামের রত্নভাণ্ডারের খানিকটা অংশ সে তুলে দিল ডিয়েগোর হাতে।

আনাপুরামের জাহাজে আটজন সুন্দরী মহিলাও ছিল। তার মধ্যে আনাপুরামের বোন, রাজকুমারী সুবনাকে নিয়ে নিল গঞ্জালেস। আনাপুরাম এর সঙ্গে গঞ্জালেসের বিয়ে দিতে চেয়েছিল, সুতরাং রাজকুমারী সুবনা তো গঞ্জালেসের বৌ প্রায় হয়েই গেছে। সুবনা

খুব কান্নাকাটি করায় তার মুখ বেঁধে রাখা হল, আর বাকি মেয়েদের তুলে দেওয়া হল ডিয়েগোর জাহাজে।

এবার গঞ্জালেস তার ভাইকে নিরালায় ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, "তুই এক কাজ কর্! এক্ষুনি চট্টগ্রামের দিকে রওনা হয়ে যা! মোগলরা এখন তোকে মরিয়া হয়ে খুঁজবে, তুই এখন কিছুদিন সন্দ্বীপে গিয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাক। আমি এদিকে মোগলদের সামলাচ্ছি। আমাদের বাড়ির লোকজনও অনেকদিন খবর পায়নি কিছু, তুই গেলে তারা নিশ্চিন্ত হবে।"

শায়েস্তা খাঁ যে বিরাট বাহিনী নিয়ে চট্টগ্রাম দখল করতে গেছে, সে খবর ডিয়েগো রাখে না। পর পর দুটি যুদ্ধ জয় করে সে দারুণ খুশি, ধনরত্নও অনেক পাওয়া গেছে, এখন কিছুদিন সে বিশ্রাম নিতে চায়। সে খুশি মনেই রাজী হয়ে গেল।

গঞ্জালেস বলল, "তা হলে আর দেরি করিস না, তুই আজ রাত্রেই এগিয়ে যা। আর দেখিস, আনাপুরামের খবর যেন চট্টগ্রামের দিকে না ছড়ায়!"

ডিয়েগো তার দুটি জাহাজ নিয়ে চট্টগ্রামের দিকে রওনা হয়ে যাবার পর গঞ্জালেস আনন্দে নিজের চিবুকে হাত বুলোতে লাগল। তার প্রত্যেকটা মতলবই সার্থক হয়েছে। আনাপুরামকে খতম করায় তার জাহাজটি পাওয়া গেল, ধনরত্নও প্রচুর। ডিয়েগোকে সে সামান্যই ভাগ দিয়েছে। নিজের ভাই হলেও ডিয়েগোর ওপর গঞ্জালেসের বিশেষ মায়া-দয়া নেই।

ডিয়েগোকে চট্টগ্রামের দিকে পাঠিয়ে লাভ হল এই যে, ডিয়েগো যদি মোগলদের হাতে ধরা পড়ে, তা হলে মোগলরা অনেকটা ঠাণ্ডা হবে। ডিয়েগোর দলবলই যে তকি খাঁকে মেরেছে, সে-খবর নিশ্চয়ই

মোগলদের কানে পৌঁচেছে এতদিনে। ডিয়েগোকে ধরতে পারলে তাদের প্রতিহিংসার ক্ষুধা অনেকখানি মিটবে। তা হলে আর এক্ষুনি তারা গঞ্জালেসের খোঁজে এদিকে আসবে না।

নদীর মোহনায় জঙ্গলের মধ্যে কিছুদিন লুকিয়ে থেকে প্রচুর খাদ্য ও পানীয় জল মজুত করে গঞ্জালেস আবার সাগরে ভাসবে। সিংহলের বাজারে দাস-দাসীগুলোকে বিক্রি করে তারপর একবার গোয়া পৌঁছতে পারলেই হল! গোয়ার পর্তুগীজ শাসনকর্তাকে একবার সে চট্টগ্রাম জয় করার প্রস্তাব দিয়েছিল। তখন তারা বিশেষ আমল দেয়নি। এবার গিয়ে গঞ্জালেস পর্তুগীজদের আবার সেই কথা বোঝাবে। গঞ্জালেস পথ দেখিয়ে আনলে পর্তুগীজদের যুদ্ধ-জাহাজের সামনে মোগলরা দাঁড়াতে পারবে না। তা হলে আবার চট্টগ্রামে ফেরা হবে।

গঞ্জালেসের জাহাজ আবার ফিরে চলল সুন্দরবনের দিকে।

সুন্দরবনের কাছে বঙ্গোপসাগরে হাঙর বিশেষ দেখা যায় না, কিন্তু বড় কুমিরের উপদ্রব। তা ছাড়া এক ধরনের খয়েরি রঙের মাছ সেই সময় দেখতে পাওয়া যেত, যাদের খয়েরি রঙের শরীরটা অনেকটা মাগুর মাছের মতন আর মুখটা বেড়ালের মতন। সেইজন্য ওদের নাম ক্যাটফিশ! এই মাছের কাঁটায় সাঙ্ঘাতিক বিষ, এক ঝাঁক ক্যাটফিশের সামনে পড়ে গেলে কোনো মানুষের আর নিষ্কৃতি নেই। ফরাসি ভ্রমণকারী বার্নিয়ের বঙ্গোপসাগরের উপকূলের কাছে তিমি আর ডলফিনও দেখেছিলেন।

তবু বিশু ঠাকুরের নিয়তিই তাঁকে বাঁচিয়ে দিল। ডুব-সাঁতার দিয়ে তিনি দস্যুদের জাহাজ থেকে অনেক দূরে চলে গিয়ে তারপর ভাসতে লাগলেন। তিনি খুব ভাল সাঁতার জানেন, কিন্তু সমুদ্রে সাঁতার কেটে আর কতদূর যাওয়া যায়! জোয়ারের টানে তিনি ভেসে চললেন।

এক সময় তাঁর পায়ের নীচে মাটি লাগল। তিনি জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ে দেখলেন, বেশ খানিকটা দূরে ঘন জঙ্গল, খুব সম্ভবত সেটা একটা দ্বীপ।

তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। পশ্চিম আকাশটা লাল। তার প্রতিবিম্ব পড়েছে জলে। মনে হয় যেন জলের মধ্যে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে।

তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে 'কপালে হু' হাত ঠেকিয়ে

প্রণাম করে বললেন, "হে ঈশ্বর, তোমার কৃপায় আমি আমার জীবন ফিরে পেয়েছি। ঘৃণ্য দাসত্ব আমায় মেনে নিতে হয়নি। এখন আমার শরীরে আবার আগেকার শক্তি ফিরিয়ে দাও। এর পর যতদিন বাঁচব, আমি অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করে যাব।"

বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়েছেন বলেই যেন তাঁর শরীরের সব ব্যথা-বেদনা জলে ধুয়ে গেছে। কিন্তু পেটের মধ্যে হু-হু করে জ্বলছে খিদে। এই ক'দিন তাঁর যেন ক্ষুধা-তৃষ্ণা বোধও ছিল না।

তীরের দিকে তিনি খুব সাবধানে এগোলেন। সন্ধের পর অচেনা জঙ্গলে পদে-পদে বিপদ। তবু বিশু ঠাকুরের মনে হল, ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের হাতে বন্দী থাকার চেয়ে হিংস্র কোনো জন্তুর কাছে প্রাণ দেওয়াও ভাল। একটা বাঘ আর একটা বাঘকে কক্ষনো মেরে ফেলে না, সিংহ কক্ষনো অন্য সিংহকে মারে না, কিন্তু মানুষ মানুষকে মারে।

তীরের ওপর এসে বিশু ঠাকুর খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তার শরীর খুবই দুর্বল। কিন্তু খাবার না পেলে তিনি আর চলাফেরাই করতে পারবেন না। কিন্তু এখন খাবার পাওয়া যাবেই বা কী করে? সন্ধেবেলা জঙ্গলের মধ্যে ঢোকাও যাবে না। বাঘের মুখে পড়ার ভয় তো আছেই, তা ছাড়া আছে বিষাক্ত সাপের ভয়।

একটা পচা গন্ধ তাঁর নাকে আসছিল প্রথম থেকেই। তিনি এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখলেন, খানিকটা দূরে একটা মাছ পড়ে আছে। খুব সম্ভবত দু' তিন দিনের পচা। ভাটার সময় খুব তাড়াতাড়ি জল নেমে গেলে অনেক সময় দু' একটা মাছ এ-রকম পাড়ে

থেকে যায়।

বিশু ঠাকুর কাছে গিয়ে মাছটাকে দেখলেন। অচেনা কোনো সামুদ্রিক মাছ। বিকট পচা গন্ধ। খিদের জন্য মানুষ কত কী খায়, কিন্তু বিশু ঠাকুরের সেই পচা মাছ খাওয়ার প্রবৃত্তি হল না।

সেখান থেকে সরে এসে, একটু পরিষ্কার জায়গা দেখে বিশু ঠাকুর চিত হয়ে শুয়ে পড়লেন। সাপ আসুক, বাঘ আসুক কিংবা জল থেকে কুমির আসুক, কোনো উপায় নেই, সারারাত এই-ভাবেই শুয়ে থাকতে হবে। কাল সকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকলে তারপর দেখা যাবে কোনো খাবার পাওয়া যায় কি না!

"এই, তুই কে রে?"

বিশু ঠাকুর দারুণ চমকে উঠলেন। উঠে বসলেন ধড়ফড় করে। কে কথা বলল? তিনি চারদিকে তাকিয়ে কারুকে দেখতে পেলেন না। তবে কি তিনি ভুল শুনলেন? কিংবা জঙ্গলের অন্ধকারের মধ্যে কেউ দাঁড়িয়ে তাঁকে লক্ষ করছে!

"এই, তুই কে?"

এবার বিশু ঠাকুরের বুক কেঁপে উঠল ভয়ে। আওয়াজটা আসছে ওপর দিক থেকে। আকাশ থেকে কোনো অশরীরী আত্মা কথা বলছে?

"তুই কে বল শিগগির! নইলে এক্ষুনি তোকে শেষ করে দেব!"

বিশু ঠাকুর হাত জোড় করে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, "আমি জলে ভেসে এসেছি, আমি একজন সামান্য লোক······বিপদে পড়ে এসেছি এখানে······আপনি যে-ই হোন, আমার ওপর দয়া করুন! আমি কখনো কারুর কোনো ক্ষতি করিনি!"

তখন একটু দূরে একটা গাছের ওপর ডালপালা সরানোর

শব্দ হল। আবার কে যেন বলল, "ও, তুই বাঙালী? এদিকে চলে আয়, এই গাছের কাছে।"

বিশু ঠাকুর আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলেন সেই গাছটার কাছে। এর মধ্যেই এমন অন্ধকার হয়ে গেছে যে, তিনি ওপর দিকে তাকিয়ে কিছু দেখতে পেলেন না।

"তোর কাছে অস্তর-টস্তর কিছু আছে? তুই খুনে-ডাকাত নোস তো?"

বিশু ঠাকুর দু' হাত উঁচু করে বললেন, "এই দেখুন, আমার কাছে কিছুই নেই। পরনের এই ভিজে কাপড়টুকুই সম্বল।"

"তা হলে ওখানে শুয়ে ছিলি কেন, গাধা? প্রাণের ভয় নেই? এই গাছের ওপর উঠে আয়!"

বিশু ঠাকুরের গাছে চড়ার শক্তি নেই। তবু সেই অদেখা লোকটির হুকুম অমান্য করতে সাহস পেলেন না।

তিনি গাছটাকে জড়িয়ে ধরে উঠতে শুরু করলেন। খানিকটা ওঠার পর ওপর থেকে একটা সবল হাত নেমে এসে তাঁকে ধরে টেনে তুলে নিল।

সুন্দরবনের গাছ সাধারণত ছোট-ছোট হয়, সেই তুলনায় এই গাছটি বেশ বড় আর অনেক ডালপালা। সেই গাছের একেবারে ডগার কাছে দু' তিনটি ডাল নিয়ে বেশ একটি শক্ত মাচা বাঁধা। সেই মাচার ওপরে বসে আছে একজন বেশ শক্ত-সমর্থ লোক, মুখ ভর্তি দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল।

বিশু ঠাকুর খুব আবছা ভাবে দেখতে পেলেন লোকটিকে। একবার তাঁর মনে হল, লোকটি বোধহয় পাগল। কিন্তু তিনি আর কিছু চিন্তা না করে কাঙালীর মতন কাতর গলায় বললেন, "আপনার

কাছে কিছু খাবার আছে? খিদেতে আমি মরে যাচ্ছি। আপনি আমায় বাঁচান!"

"কাঁচা মাংস খেতে পারবি?"

"পারব!"

লোকটি ছাল-ছাড়ানো একটি আস্ত হরিণের ঠ্যাং বিশু ঠাকুরের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "প্রথমটায় একটু শক্ত লাগবে। ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খা, এই কাঁচা মাংস কিন্তু হজম হয় তাড়াতাড়ি!"

প্রথম কামড়টা বসিয়েই বিশু ঠাকুরের চোখে জল এসে গেল। এমন ভাবে গাছের ডগায় বসে কাঁচা মাংস খেতে হবে, জীবনে তিনি কল্পনাও করেননি। তবু সেই কাঁচা মাংসই যেন অমৃত মনে হল, তিনি খুব উপভোগ করে চিবিয়ে-চিবিয়ে খেতে লাগলেন।

"তুই কোথা থেকে ভাসতে-ভাসতে এলি?"

"আমি বোম্বেটেদের হাতে ধরা পড়েছিলাম!"

তারপর বিশু ঠাকুর সংক্ষেপে সব ব্যাপারটা জানালেন।

লোকটি সব শুনে বলল, "তোর দেখছি আমারই মতন অবস্থা! হা অদৃষ্ট! অদৃষ্টই তোকে টেনে এনেছে এখানে।"

"আপনিও বোম্বেটেদের হাতে ধরা পড়েছিলেন?"

"ধরা পড়িনি, তবু বাঁচতে পারলাম কই? আমার নিবাস ছিল মামা-ভাগ্নে গ্রামে। মামা-ভাগ্নে গ্রামের নাম শুনেছ? দুর্গাচকের পাশে। এক মামা আর ভাগ্নেকে একই দিনে বাঘে নিয়ে যায় বলে গ্রামের ঐ নাম। সেই গ্রামে ছিল আমাদের দু' পুরুষের ঘর-বাড়ি। আমার নাম মাধবদাস, জাতিতে জেলে। তা এক রাত্রে ফিরিঙ্গি ডাকাতরা এসে পড়ল গ্রামে, ঘরবাড়ি সব জ্বালিয়ে দিল। ধরা পড়ার আগেই আমি বাড়ির লোকজনদের নিয়ে নৌকোয় চেপে ভেসে পড়লাম।

কিন্তু ভাগ্যে আমার সুখ নেই। নৌকো সমুদ্দুরে পড়তে না পড়তেই ঝড়ের মধ্যে উল্টে গেল, উঃ সে কী ঝড়, বাপের জন্মে অমন তুফান দেখিনি, আর তেমনি বড়-বড় ঢেউ। আমার বউ, দুটি ছেলে, একটা মেয়ে কোথায় চলে গেল জানি না, ডুবেই মরেছে নিশ্চয়, আমি ভাসতে ভাসতে এখানে এসে ঠেকেছি। সেই থেকে এখানেই আছি। আর লোকালয়ে ফিরে যাওয়ার সাধ নেই।"

বিশু ঠাকুর বললেন, "বোম্বেটেরা এরকম কত পরিবারের সর্বনাশ করেছে, তার ঠিক নেই। দেশের রাজা বসে থাকেন দিল্লিতে, তিনি কোনো খবরই রাখেন না। তবে……এবার বোধহয় একটা উপায় হবে!"

মাধবদাস বলল, "আর উপায়! আমার তো সবই গেছে! তুমি কাঁচা মাংস খেতে পারছ তো? এখানে থাকতে গেলে ঐ মাংসই খেতে হবে। এখানে তো আগুন জ্বালার উপায় নেই।"

"কেন?"

"ঘর ছেড়ে পালাবার সময় তো আর ট্যাঁকে চকমকি পাথর গুঁজে আনার কথা মনে ছিল না! এখানে চকমকি কোথায় পাব? তোমার নাম কী, তা তো বললে না?"

"আমার নাম বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য। লোকে আমায় বিশু ঠাকুর বলে ডাকে।"

মাধবদাস চমকে উঠে বলল, "ব্রাহ্মণ! আরে ছি, ছি, এতক্ষণ না জেনে তুই-তুকারি করেছি। তোমার গায়ে আমার পা-ও ঠেকেছে। না জেনে ভুল করেছি, দোষ নিয়ো না ঠাকুর!"

এই বলে সে অন্ধকারের মধ্যে বিশু ঠাকুরের পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে গেল।

বিশু ঠাকুর মাধবদাসের হাত জড়িয়ে ধরে বললেন, "ও কথা বোলো না! দেশের এই দুঃসময়ে বামুন-চাঁড়াল সব সমান। বামুন বলে বোম্বেটেরা কি আমায় রেয়াত করেছে? আর সবার সঙ্গে আমাকেও তো ক্রীতদাস হিসেবে নিয়ে যাচ্ছিল। তা ছাড়া, তুমি আমায় এই বিপদে সাহায্য করেছ। তুমি আমার গুরুর সমান। এসো, আজ থেকে আমরা বন্ধু হই। এইটুকু মাচার ওপর থাকতে গেলে গায়ে তো পা লাগবেই। তুমি যখন ইচ্ছে আমার গায়ে পা তুলে দিও! তা ভাই মাধবদাস, তুমি এই রকম মাচার ওপর থাকো কেন?"

"এখানে বড় বাঘের উপদ্রব। নীচে ঘর বেঁধে থাকলে আর একদিনও টিকতে হত না। চোখ মেলে থাকো, ঠাকুর, একটু পরেই এখানে বাঘ আর নেকড়ের আনাগোনা দেখতে পাবে।"

"তুমি এখানে কতদিন আছ?"

"কে জানে? দিনক্ষণের তো হিসেব রাখি না। তবে দু' তিন বছর তো হবেই। চার বছরও হতে পারে!"

বেশ খানিকটা মাংস খাবার পর খিদেটা শান্ত হল। আর অমনি যেন এতদিনের জমানো ক্লান্তি এসে জুড়ে বসল তাঁর চোখের পাতায়। বিশু ঠাকুর আর চোখ মেলে থাকতে পারলেন না, কথা বলতে বলতেই ঘুমিয়ে পড়লেন এক সময়।

মাধবদাস সারা রাত জেগে বসে পাহারা দিল তাঁকে। তার অভ্যেস হয়ে গেছে, সে মাচার ওপরে ঘুমোলেও পড়ে যায় না, কিন্তু বিশু ঠাকুর তো পড়ে যেতে পারেন।

দিনের আলো ফোটবার সঙ্গে-সঙ্গে অসংখ্য পাখির ডাকে ঘুম ভেঙে গেল বিশু ঠাকুরের। চোখ মেলে মাধবদাসকে দেখেই তিনি

ভাবলেন, তা হলে স্বপ্ন নয়?

এই যে সমুদ্রে ভাসতে-ভাসতে এক জায়গায় এসে ওঠা, তারপর অন্ধকারের মধ্যে গাছের ডগায় এক মাচার ওপর বসে কাঁচা মাংস খাওয়া, এ-সব স্বপ্ন নয়।

বিশু ঠাকুরের মনে হল, এমন একটি সুন্দর সকাল তাঁর সারা জীবনে আসেনি। পর পর কয়েকটি দিন যে অসম্ভব কষ্ট আর যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে কেটেছে, সেই তুলনায় আজ এই ঘুমের পর জেগে ওঠা কত চমৎকার। রাজভোগ খেয়ে মখমলের বিছানায় শুয়ে থাকলেও এত আনন্দ হয় না।

মাধবদাসের সঙ্গে তিনি গাছ থেকে নেমে এলেন।

মাধবদাসকে দেখলে মনে হয় আদিম জংলি মানুষ। মাথার চুল ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে, দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলে মুখখানা প্রায় ঢাকা, অতি ছেঁড়া ঝুলি-ঝুলি একটা কাপড় তার কোমরে জড়ানো। সে সঙ্গে সব সময় তীর-ধনুক রাখে। ধনুকটা ঠিকই আছে কিন্তু তীরগুলো বড় মজার, তীরের ডগায় লোহার ফলার বদলে বসানো আছে মোটা ধারালো কাঁচ। মাধবদাসই বলল যে, স্রোতে ভাসতে-ভাসতে তিনটি বোতল এক সময় এখানে এসে উঠেছিল, সেই বোতল ভেঙেই সে অস্ত্র বানিয়েছে। ঐ তীর দিয়েই সে হরিণ শিকার করে।

বিশু ঠাকুর জায়গাটার ভাল-মতন খোঁজ-খবর নিলেন।

মাধবদাস এই জঙ্গলের মধ্যে বেশি দূর যায় না। সুতরাং সে জানে না এ-জঙ্গল কোথায় শেষ হয়েছে, কিংবা এটা একটা দ্বীপ কি না। এই জায়গাটা ভারতবর্ষের মধ্যে, না অন্য দেশ, তা-ও সে জানে না। তবে, তাকে দু' একদিন অন্তর ডান দিকে কিছুটা দূরে একটা

নদীতে যেতে হয় জল আনতে। সমুদ্রের জল এতই লোনা যে, খাওয়া যায় না, নদীর জলও লোনা, তবে ঠিক জোয়ার-ভাটার হিসেব করে গেলে, ভাটার সময় কম লোনা থাকে। তা ছাড়া, সমুদ্রের জল খেলে পেট ব্যথা করে।

নদীর কথা শুনেই বিশু ঠাকুর বুঝলেন, তা হলে এটা কোনো দ্বীপ নয়। কিংবা দ্বীপ হলেও নদী পেরিয়েই তো অন্য জায়গায় যাওয়া যায়।

একটা ঝোপের মধ্যে মাধবদাস রীতিমত ছোটোখাটো একটা সংসার পেতে রেখেছে! সবই প্রায় সমুদ্রের ঢেউয়ে ভেসে আসা জিনিস। আর হরিণের চামড়া। কয়েকটা বড় মাছের কাঁটা, যা, দিয়ে ছুঁচ কিংবা ছুরির কাজ চালানো যায়। একটা মাটির মালসাও আছে, কোনো উল্টে যাওয়া নৌকোর জিনিস নিশ্চয়ই। সেটাতেই সে জল রাখে।

বিশু ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে সমুদ্রের কিনারায় দাঁড়ালে কোনো জাহাজ-টাহাজ দেখা যায় না?"

মাধবদাস বলল, "হ্যাঁ, দেখা যাবে না কেন? বোম্বেটেদের জাহাজও দেখি!"

"আর নৌকো?"

"তাও দেখি। মাছ-ধরা নৌকো। বাঘের ভয়ে কেউ এদিকে ভেড়ে না।"

"সেই মাছ ধরার নৌকোয় কোন্ জাতের লোক থাকে? দেখে বুঝতে পারো?"

"হ্যাঁ। এই আমাদেরই মতন বাঙালী লোক।"

"তা হলে এটা নিশ্চয়ই সুন্দরবনেরই কোনো জায়গা। তুমি

জেলে-নৌকো দেখলে ডাকতে পারো না? গাছের ডালে একটা কিছু নিশানা বেঁধে নাড়লেই তো তাদের চোখ পড়ে।"

"ঠাকুরমশাই, তোমাকে তো আমি বলেইছি, আমার আর লোকসমাজে ফিরে যাবার ইচ্ছে নেই। আমি এখানেই বেশ আছি। দিনের বেলায় এদিক-ওদিক ঘুরি, আর রাতে মাচায় উঠে শুয়ে থাকি। সাবধানে থেকো, এদিকে কিন্তু এক-এক সময় দিনের বেলাতেও বাঘ আসে।"

"বাঘ এসে পড়লে তুমি কী করো?"

"একটা সুবিধে আছে। এই জঙ্গলে প্রচুর বাঁদর, বাঘ দেখলেই তারা হুপ-হাপ শুরু করে দেয়। বাঘ বাঁদরের মাংস খেতে খুব ভালবাসে কিনা! বাঁদরগুলোর চ্যাঁচামেচি শুনলেই আমি মাচায় উঠে পড়ি!"

"নদী থেকে যে জল আনতে যাও, তখন ভয় নেই?"

"ভয় আছে বই-কী। সমুদ্রের ধার ঘেঁষে-ঘেঁষে সাবধানে যাই। একদিন বাঘের পেটেই যাব, তাও জানি।"

সকালেও কাঁচা মাংস খেতে হবে। বিশু ঠাকুর ভাবলেন, মাংসগুলো একটু ঝলসে নিতে পারলে স্বাদ পাল্টে যায়। কিন্তু আগুন কী করে জ্বালবেন। জল-কাদার দেশ, এখানে পাথর পাওয়া যাবে না। বিশু ঠাকুর শুনেছিলেন, শুকনো দুটো কাঠ দিয়ে ঘষলেও আগুনের ফুলকি বেরোয়। বনে-জঙ্গলে আগুন লাগে এইভাবে, যাকে বলে দাবানল।

তিনি কিছু শুকনো পাতা এক জায়গায় জড়ো করে তারপর গাছের দুটো শুকনো ডাল ভেঙে নিলেন। তারপর অনেকক্ষণ ধরে ঘষতে লাগলেন ডাল দুটো। কিন্তু একটুও আগুনের ফুলকি বেরুল

না। দু' দিন আগেই দারুণ বৃষ্টি হয়ে গেছে, তাই কোনো গাছের ডালই আসলে সে-রকম শুকনো নয়।

বিশু ঠাকুরকে অনেকক্ষণ ধরে ব্যর্থ চেষ্টা করতে দেখে মাধবদাস বলল, "ঠাকুর, অত কষ্ট করছ কেন? ছ্যাখো বাঘ সিংহী এরা সবাই কাঁচা মাংস খায় আর সেই জন্যই ওদের গায়ে অত জোর। ওদের কখনো পেটের রোগ হয় না, আর বুড়ো বয়েসে কবিরাজি ওষুধও খেতে হয় না। এখানে আসার আগে আমিও এত ষণ্ডা ছিলাম না।"

বিশু ঠাকুর বললেন, "কাল রাতে প্রচণ্ড খিদের মুখে খেয়ে নিয়েছিলাম, কিন্তু এখন কেমন যেন গা গুলিয়ে উঠছে।"

"আমারও প্রথম প্রথম ও-রকম হয়েছিল। তারপর আস্তে আস্তে নিজেই শিখলাম যে, সমুদ্রের নোনা জলে কাঁচা মাংস অনেকক্ষণ ডুবিয়ে রাখলে মাংস নরম হয়, আর স্বাদও ভাল হয়। তুমিও দু-চারদিন থাকো। থাকতে থাকতে সব অভ্যেস হয়ে যাবে।"

"তার মানে? আমি এখানে থেকেই যাব নাকি!"

"তাহলে কী করবে?"

"এখান থেকে বেরুবার একটা রাস্তা খুঁজে বার করতেই হবে। আমার অনেক কাজ বাকি আছে।"

"তা তুমি যেতে চাও যেও। তোমার নিশ্চয়ই বাড়িতে বৌ ছেলেমেয়ে আছে। আমার তো আর বিশ্ব-সংসারে কেউ নেই, তাই আমি কোথায় যাব!"

"অমন কথা বলে না, মাধবদাস। জীবনে কখনো নিরাশ হতে নেই। তোমার এখনো বয়েস রয়েছে, শরীরে শক্তি রয়েছে, লোকজনের মাঝখানে ফিরে গেলে তুমি এখনো অনেক কাজ করতে পারবে।

তুমিও যাবে আমার সঙ্গে !”

“না, ঠাকুর, আমি আর যাব না ! মানুষের চেয়ে আমার জন্তু-জানোয়ারদেরই বেশি ভাল লাগে এখন।”

“বোম্বেটেদের জন্য তোমার ঘরবাড়ি পুড়ে গেছে, তোমার এমন সর্বনাশ হয়েছে, সেজন্য তোমার প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে করে না ?”

“আমি আর কী করে শোধ নেব ! এখান দিয়ে যখন বোম্বেটেদের জাহাজ যায়, তখন আমি ওদের খুব গালিগালাজ করি। ওরা শুনতে পায় না অবশ্য, তবু প্রাণ ভরে ওদের গালাগালি দিয়ে আমার মেজাজটা একটু শান্ত হয় !”

“এই এক আমাদের বাঙালীদের দোষ। আমরা শুধু গালাগালি দিতেই জানি। কাজে কিছু করে দেখাতে পারি না। পাশাপাশি দু-তিনখানা গ্রামের সব লোক একজোট হলে কি আমরা বোম্বেটেদের ঠেকাতে পারি না ? নিশ্চয়ই পারি। তা না করে আমরা ভয়ে পালাই কিংবা দূর থেকে গালাগালি দিই। আর ধরা পড়লে কাঁদি।”

বিশু ঠাকুর উঠে দাঁড়িয়ে আবার বললে, “এই ছাখো, মাধবদাস, আমার সারা গায়ে চাবুকের দাগ। সমস্ত শরীর দাগড়া-দাগড়া হয়ে গেছে। ঘুঁষি মেরে ওরা আমার মুখ দিয়ে রক্ত বার করেছে, আমাকে বেঁধে উল্টো করে ঝুলিয়ে রেখেছে। আমি এর শোধ নিতে যদি না পারি, তা হলে আমার জীবনটাই ব্যর্থ ! এর শোধ আমি নেবই ! সেই জন্যেই আমি বেঁচে আছি।”

মাধবদাস বলল, “তুমি একলা ঐ দুর্দান্ত বোম্বেটেদের সঙ্গে কী করে পারবে ? ওদের কাছে বন্দুক আছে, তরোয়াল আছে। আমি তো বাপের জন্মে বন্দুক চোখেই দেখিনি, আর কোনোদিন একখানা

তরোয়াল ছুঁয়েও দেখিনি !”

“বাঙালী অস্ত্র ধরতে ভুলে গেছে বলেই চতুর্দিক থেকে সবাই তাকে এখন মারছে। ওরা যখন আমায় মাস্তুলের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিল, তখন আমি ওদের দেখলেই দম বন্ধ করে অজ্ঞান হবার ভান করে থাকতাম। কিন্তু শেষের দিকে আমার জ্ঞান ছিল। ওদের কথাবার্তা শুনে আমি বুঝেছি যে, দিল্লি থেকে সম্রাট-বাহাদুর শায়েস্তা খাঁ নামে এক জবরদস্ত সেনাপতি পাঠিয়েছেন ডাকাতদের দমন করবার জন্য। তিনি অনেক সৈন্যসামন্ত নিয়ে গেছেন চট্টগ্রামে, সেখানে ডাকাতদের ঘাঁটি ভেঙে দেবার জন্য। আমি এখান থেকে যে-ভাবে হোক চট্টগ্রামে যাব। তারপর শায়েস্তা খাঁর সৈন্যবাহিনীতে নাম লেখাব। তারপর অন্তত একজন-না-একজন ডাকাতকে আমি শেষ করবই।”

“তুমি বামুন হয়ে মোগলের সৈন্য হবে ?”

“তাতে কী হয়েছে ? বামুনরা কি যুদ্ধ করতে জানে না ? তুমি শাস্ত্র পড়োনি, মহাভারতে আছে, পরশুরাম ছিলেন সকলের চেয়ে সেরা বীর, কিন্তু তিনি বামুন। তখন বামুনরাই রাজপুত্তুরদের যুদ্ধবিদ্যা শেখাত !”

এই সময় হঠাৎ কয়েকটা বাঁদরের হুপ-হুপ আওয়াজ হতেই চমকে উঠল মাধবদাস। সে বিশু ঠাকুরের হাত ধরে টান মেরে বলল, “ঠাকুর, শিগগিরই গাছে উঠে পড়ো ! যম আসছে।”

দু’জনে তরতর করে গাছ বেয়ে উঠে সেই মাচার ওপর বসে রইলেন। একটু পরেই একদল বাঁদর এক গাছ থেকে আর এক গাছে লাফিয়ে-লাফিয়ে চলে এল সেদিকে।

মাধবদাস বলল, “একদম চুপটি করে বসে থাকো। কোনো

শব্দ কোরো না।”

ওরা যে গাছটায় বসে ছিল, কয়েকটি বাঁদর সেই গাছেও উঠে এল। তারা বার বার চেয়ে দেখতে লাগল বিশু ঠাকুরকে। এখানে একজন লোক ছিল, হঠাৎ কী করে দু’জন হয়ে গেল সেই ভেবে তারা অবাক হচ্ছে।

খানিক পরে একটু দূরে ফেউ-ফেউ ডাক শোনা গেল। বিশু ঠাকুর জানেন, বাঘ দেখলে শেয়ালরা ঐ রকম ভাবে ডাকে। তা হলে এবার বাঘ আসবে।

বাঘটা এল রাজা-মহারাজাদের মতন গম্ভীর চালে। এক পা এক পা করে এগোচ্ছে, আর এদিকে-ওদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে। হঠাৎ একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ে সে গর্জন করে উঠল। সে ডাক শুনলে পিলে পর্যন্ত চমকে যায়। বিশু ঠাকুর এত কাছ থেকে আগে কখনো বাঘের ডাক শোনেননি। তাঁর মতন সাহসী লোকেরও বুকটা দুপ-দুপ করতে লাগল সেই ডাক শুনে।

বাঘটা ক্ষুধার্ত, বাঁদরগুলোর একটাকেও ধরতে পারেনি বলে খুব রেগে আছে। ঝোপ থেকে বেরিয়ে সে আবার চলল সমুদ্রের দিকে।

মাধবদাস ফিসফিস করে বলল, “এ-ব্যাটাকে আমি চিনি। এ ব্যাটা স্বয়ং দক্ষিণরায়। এই বনে যত বাঘ আছে, তার মধ্যে এইটাই সবচেয়ে বড়।”

বিশু ঠাকুর একদৃষ্টে বাঘটাকে দেখছেন। এই গাছতলা দিয়ে যখন বাঘটা যায়, তখন একটা উৎকট গন্ধ নাকে এসেছিল। তলা থেকে গাছের ওপরের মাচাটা দেখা যায় না ভাগ্যিস। বিশু ঠাকুরের মনে হচ্ছিল, অত বড় বাঘ ইচ্ছে করলেই বোধহয় এক লাফে

এই মাচা পর্যন্ত পৌঁছোতে পারে।

বাঘটা সমুদ্রের জলের মধ্যে খানিকটা নেমে চুপ করে বসে রইল। ঠিক যেন স্নান করছে। বিশু ঠাকুর ভাবলেন, কাল যখন তিনি ভাসতে ভাসতে এখানে এসে ঠেকেছিলেন, তখন যদি ঐ বাঘটা ওখানে বসে থাকত? তা হলে তাঁর কয়েকখানা হাড়গোড় শুধু পড়ে থাকত ওখানে।

বাঘেদের বোধহয় জলে মাথা ডোবানোর ব্যাপারে কোনো নিষেধ আছে। তাই শুধু গা-টুকু ডুবিয়েই স্নান সেরে বাঘটা উঠে এল। তারপর সে আবার ঢুকে গেল গভীর জঙ্গলে। বাঘটা যতক্ষণ ছিল, ততক্ষণ বাঁদরগুলো অনর্গল চ্যাঁচামেচি করছিল, বাঘটা চলে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে তারাও সেদিকেই গাছের ওপর লাফাতে-লাফাতে যেতে লাগল।

হাঁপ ছেড়ে মাধবদাস বলল, "ঐ বাঁদরগুলোর জন্যই বেঁচে আছি! ঐ বাঁদরগুলোর স্বভাব জানো তো? বাঘ সুযোগ পেলেই বাঁদর ধরে খায়। আবার বাঁদরগুলোও সব সময় বাঘের কাছাকাছি থেকে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে ওদের বিরক্ত করে মারে। বাঘ আওয়াজ একদম পছন্দ করে না। এমনও দেখেছি, বাঁদরের চ্যাঁচামেচিতে অতিষ্ঠ হয়ে বাঘ দৌড়ে পালাচ্ছে।"

বিশু ঠাকুর বললেন, "চান-টান করল, অথচ এখনো খাবারের জোগাড় নেই বেচারির!"

"ওর খাবারের অভাব কী? এ-জঙ্গলে প্রচুর হরিণ।"

"কই, হরিণ তো এ পর্যন্ত একটা-ও দেখলাম না।"

"হরিণ যখন আসবে, তখন এক পাল আসবে। একটা দুটো তো নয়! সেই জন্যই হরিণ মারার বড় সুবিধে। চলো নীচে নামি।"

"দূরে বাঁদরদের চ্যাঁচামেচি এখনো শোনা যাচ্ছে। যদি বাঘটা হঠাৎ আবার এদিকে ফিরে আসে?"

মাধবদাস অদ্ভুতভাবে হেসে বলল, "যদি কপালে বাঘের হাতে মৃত্যু লেখা থাকে, তা হলে কি আর কেউ খণ্ডাতে পারবে? অত ভাবলে চলে না। মরতে তো একদিন হবেই!"

বিশু ঠাকুর গম্ভীর ভাবে বললেন, "মরতে একদিন হবেই তা জানি। তবে মিছিমিছি বাঘের পেটে প্রাণ দেবার আগে আমি ঐ বোম্বেটেদের ওপর প্রতিশোধ নেবই নেব! চট্টগ্রাম কী ভাবে যাওয়া যায়, তুমি বলতে পারো?"

"ঠাকুর, আমি চট্টগ্রাম বলে কোনো দেশের নামই শুনিনি।"

"তুমি তো আগে মাছ ধরতে। নৌকো নিয়ে কখনো সমুদ্রের দিকে আসোনি?"

"অনেকবার এসেছি। ইলিশের মরসুমে অনেক জেলে আসে। খুলনে, ফরিদপুর, হুগলি, চাটগাঁ থেকেও জেলেরা আসে, কিন্তু চট্টগ্রামের কথা শুনিনি কারুর কাছে।"

"ঐ চাটগাঁই তো চট্টগ্রাম।"

"হ্যাঁ, সে-জায়গাও সমুদ্রের কিনার ঘেঁষে। মাতলা নদী ধরে আরও পূব দিকে যেতে হয়।"

"মাধবদাস, আমরা যদি একটা নৌকো বানাই, তা হলে আমরা দু'জনে মিলে চট্টগ্রামে যেতে পারি না?"

"এখনো তোমার মাথায় শুধু ঐ চিন্তা? ঠাকুর, যেতে হয় তুমি চট্টগ্রামে যেও, আমি তো তোমার সঙ্গে যাব না! আমি এখানে বেশ আছি। মানুষের মুখ দেখতে হয় না বলে শান্তিতে আছি। তার চেয়ে বরং চলো, তোমায় একটা নতুন জিনিস

খাওয়াই!”

“কী জিনিস?”

“মধু। কাছেই এক জায়গায় একটা মৌচাক আছে। সেখান থেকে আমি মাঝে মাঝে খানিকটা চাক ভেঙে আনি।”

“খালি হাতে? খালি হাতে কেউ মৌচাক ভাঙতে পারে?”

“তুমি মশাল জ্বেলে ধোঁয়া করার কথা বলছ তো? সে আমি আর আগুন এখানে পাব কোথায়? আমি খানিকটা চাক ভেঙে নিয়েই এক দৌড় মারি। তারপর সেটা কোনো ঝোপের মধ্যে ফেলে দিয়ে একেবারে সমুদ্দুরে গিয়ে মাথা ডুবিয়ে বসে থাকি। এর মধ্যেই কিছু মৌমাছি কামড়ায় বটে, কিন্তু সেটুকু তো সহ্য করতেই হবে!”

“বেশ ভাল বুদ্ধি করেছ তো! কিন্তু এখন আমার মধু খাবার ইচ্ছে নেই। এখানে গাছের ওপর মাচায় শুয়ে জীবন কাটাতে পারব না। চট্টগ্রাম আমায় যেতেই হবে। তুমি যদি না যাও, আমি একাই যাব। কোনো জেলে-ডিঙি দেখতে পেলে আমায় বলো, আমি যেমন ভাবেই হোক, তাকে ডাকব। দরকার হয়, সমুদ্রে সাঁতরে গিয়ে সেই ডিঙিতে উঠব। তুমি বুঝতে পারছ না মাধবদাস, যতক্ষণ না প্রতিশোধ নেবার জন্য কিছু একটা করতে পারছি, ততক্ষণ আমার বুকের ভেতরটা জ্বলছে। কিছু-একটা না করলে আমি শান্তি পাব না।”

॥ ৯ ॥

বিশু ঠাকুরকে চট্টগ্রাম যেতে হল না, তার আগেই অন্য একটা ব্যাপার ঘটল।

বিশু ঠাকুর মাচার ওপরে ঘুমিয়ে ছিলেন, বিকেলের দিকে মাধবদাস তাঁকে ঠেলে জাগিয়ে তুলল। উত্তেজিত ভাবে বলল, "ঠাকুর, ঐ গ্যাখো, ঐ গ্যাখো।"

বিশু ঠাকুর উঠে বসে বললেন, "কী ?"

"সমুদ্রের দিকে চেয়ে গ্যাখো !"

আকাশে বিকেল শেষ হয়ে যাচ্ছে। কাল ঠিক এই রকম সময়েই বিশু ঠাকুর এইখানে পৌঁছেছিলেন। আজও আকাশের একদিকে আগুন ছড়ানো।

বিশু ঠাকুর চেয়ে দেখলেন, সমুদ্রের বুকে দুটি পালতোলা জাহাজ।

মাধবদাস জিজ্ঞেস করল, "ঠাকুর, দেখে চিনতে পারো ? এগুলোই হল বোম্বেটেদের জাহাজ। হতভাগা, বদমায়েশ, পাজি, ফিরিঙ্গি কুত্তার দল !"

মাধবদাস বিড়বিড় করে আরও খারাপ খারাপ গালাগালি দিয়ে যেতে লাগল। বিশু ঠাকুরের বুকের মধ্যে দুমদুম শব্দ হচ্ছে। বোম্বেটেদের জাহাজ ! যদি এর মধ্যে একটা গঞ্জালেসের জাহাজ হয় ! যে জাহাজে তিনি বন্দী ছিলেন !

তিনি আপন মনেই বললেন, "বোম্বেটেরা এদিকে কোথায় যাচ্ছে ?"

মাধবদাস বলল, "ভয় নেই, ওরা এখানে আসবে না। ওরা কোথায় যায় আমি জানি !"

বিশু ঠাকুর তার হাত চেপে ধরে বললেন, "তুমি জানো ? কী করে জানলে ?"

"এদিকে ওদের একটা আখড়া আছে। যে-নদী থেকে আমি জল আনতে যাই, সেই নদীরই মোহনার কাছে ওরা মাঝে মাঝে আসে। ইঁট পুড়িয়ে ওখানে ওরা একটা গম্বুজও বানাচ্ছে। আমি একদিন দূর থেকে দেখেছি !"

"চলো, সেখানে যাব !"

"তুমি কি পাগল হয়েছ, ঠাকুর ! সাধ করে কেউ বোম্বেটে-দের খপ্পরে যায় ? তুমি একলা সেখানে গিয়ে কী করবে ? বরং চাটগাঁয় গিয়ে মোগল সেপাই হতে চাও, তাই হও।"

"ঐ জাহাজে আমাদের দেশের লোকদের বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে। অন্য দেশে বিক্রি করবে। তাদের ছাড়াবার জন্য কোনো চেষ্টা করব না আমরা ?"

"আমরা মানে তুমি আর আমি ? ঠাকুর, তোমার দেখছি, সত্যিই মাথার ঠিক নেই। ঐ খুনে বোম্বেটেদের সঙ্গে আমরা দু'জনে খালি হাতে লড়তে যাব ?"

"তবে তুমি থাকো, আমি একাই যাই। কোন্ পথ দিয়ে যেতে হবে শুধু বলে দাও !"

"এক্ষুনি অন্ধকার হয়ে আসবে। যাবার পথেই তোমায় বাঘে খেয়ে ফেলবে।"

"তুমিই তো সকালে বলেছিলে যে, কপালে যদি লেখা থাকে বাঘের পেটে প্রাণ যাবে, তা হলে তা কেউ খণ্ডাতে পারবে না। অন্ধকারে আমি লুকিয়ে-লুকিয়ে দেখে আসব। দেখা দরকার, সত্যিই ও দুটো গঞ্জালেসের জাহাজ কি না, আর ঐ জাহাজে বন্দীরা আছে কি না!"

"ঐ বন্দীদের মধ্যে তোমার আপনজন কেউ আছে বুঝি? তোমার ছেলে বা বউ!"

"না, তেমন আপনজন কেউ নেই। আমি বিয়ে করিনি। তবে একটি ছোট মেয়েকে সাপে কামড়েছিল, তাকে আমি বাঁচিয়েছিলাম, সে-ও ঐ জাহাজে বন্দিনী। তাকে আমি বাঁচিয়েছিলাম কি ফিরিঙ্গিদের কাছে ক্রীতদাসী হবার জন্য? তা ছাড়া, আমার দেশের মানুষ সবাই তো আমার আপনজন।"

"ওখানে গেলে কোনোই লাভ হবে না। শুধু তুমি বেঘোরে প্রাণটা হারাবে।"

"তবু যেতেই হবে আমাকে। তুমি আমাকে পথটা দেখিয়ে দাও!"

বিশু ঠাকুর গাছ থেকে নেমে পড়লেন। মাধবদাসও সঙ্গে নেমে এসে বলল, "ঠাকুর, আবার তোমাকে বলছি, যেও না, শুধু-শুধু প্রাণটা দিও না।"

"যেতে আমায় হবেই!"

"তবে এই দিকে সমুদ্রের ধার দিয়ে দিয়ে চলে যাও। একসময় নদীর মোহনা দেখতে পাবে। একটা কথা বলে দিই তোমায়, হেঁতাল গাছ চেনো তো, ঐ হেঁতালের ঝোপ দেখলে খুব সাবধান। ঐ হেঁতাল-ঝোপেই বাঘ লুকিয়ে থাকে। জলের একেবারে ধার ঘেঁষে

যেও, বাঘ দেখলে যাতে সমুদ্দুরে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারো।"

বিশু ঠাকুর মাধবদাসকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "ভাই, তুমি আমার জীবন বাঁচিয়েছ। যদি বেঁচে থাকি, তা হলে তোমার কথা কখনো ভুলব না।"

আর দেরি না করে বিশু ঠাকুর হাঁটতে শুরু করলেন। জাহাজ দুটোকে তিনি তখনও কিছু দূরে ঝাপসা ভাবে দেখতে পাচ্ছেন। একটু পরেই পুরো অন্ধকার হয়ে যাবে।

খানিক পরে তিনি পর পর কয়েকবার কামান দাগার শব্দ শুনতে পেলেন। একটা জ্বলন্ত কামানের গোলা সমুদ্রের জলে পড়ল। দস্যুরা হঠাৎ কেন কামান দাগছে, তা বিশু ঠাকুর বুঝতে পারলেন না। যদি গায়ে এসে গোলা লাগে, এই ভয়ে তিনি শুয়ে পড়লেন বালির ওপর। কিছুক্ষণ পরে সব চুপচাপ হয়ে গেলে তিনি হাঁটতে লাগলেন আবার।

কোনো বাঘের মুখোমুখি পড়তে হল না তাঁকে। এক জায়গায় তিনি শুধু দুটি খুব বড় জানোয়ার দেখলেন, অন্ধকারের মধ্যে সেগুলি কী জানোয়ার তিনি চিনতে পারলেন না। সেই সময় তিনি কোমর পর্যন্ত জলে নেমে দাঁড়িয়ে রইলেন। চাঁদ উঠেছে, কিন্তু মেঘলা আকাশ বলে জ্যোৎস্না বিশেষ নেই। কিছু দূরের জিনিস আবছা-আবছা দেখা যায়।

একটু পরে জন্তু দুটো ঢুকে গেল জঙ্গলের মধ্যে। মোটামুটি এক ঘণ্টার মতন সময় হেঁটেই বিশু ঠাকুর পৌঁছে গেলেন নদীর মোহনায়। তিনি দেখতে পেলেন জাহাজি লণ্ঠনের আলো।

বন্দীদের জাহাজ থেকে নামিয়ে গোল করে বসানো হয়েছে। মাঝখানে জ্বলছে দুটো মশাল। কয়েকজন ফিরিঙ্গি খোলা তলোয়ার

হাতে পাহারা দিচ্ছে তাদের। আর একটু দূরে একটা মোটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে আছে গঞ্জালেস, তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসেছে কয়েকজন অনুচর। মনে হয় কোনো একটা ব্যাপার নিয়ে তারা খুব উত্তেজিতভাবে আলোচনায় মত্ত।

জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে বিশু ঠাকুর সব দেখলেন। তাঁর ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে। রাগে-দুঃখে যেন চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চাইছে তাঁর।

তিনি একা, নিরস্ত্র, এতগুলো ডাকাতের সঙ্গে কী করে লড়বেন! প্রাণের ভয় নেই তাঁর, কিন্তু শুধু প্রাণ দিলে তো আর প্রতিশোধ নেওয়া হবে না!

তবু দাঁতে দাঁত ঘষে তিনি মনে মনে বললেন, "একটা কিছু করতেই হবে! একটা কিছু করতেই হবে!"

জঙ্গলের মধ্যে তিনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, সেই জায়গাটা কাদা-কাদা। বোধহয় জোয়ারের সময় জল উঠে এসেছিল। কাদায় পা গেঁথে যাচ্ছে। তবু তিনি নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেন ঐদিকে চেয়ে।

বন্দীদের মধ্যে দু'খানা করে রুটি বিলি করা হল। ঠিক ভিখারির মতন হাত বাড়াল সবাই সেই রুটি নেবার জন্য। এরা সবাই গ্রামের গৃহস্থ মানুষ, দু' বেলা পেট ভরে ভাত খেতে পেত ঠিকই, এখন মাত্র দু'খানা রুটিতে ওদের কতখানি পেট ভরবে!

গঞ্জালেস আর তার অনুচররা এখন খুব জোরে জোরে কথা বলছে, মনে হয়, কোনো ব্যাপারে ওদের মধ্যে তর্ক বেধে গেছে।

বিশু ঠাকুর ভাবলেন, আর একটু কাছে এগিয়ে গিয়ে ওদের কথাবার্তা শুনবেন। দু-এক পা এগিয়েছেন সবে মাত্র, এমন সময় কে যেন হঠাৎ তাঁর ঘাড় ধরে টানল খুব জোরে। তিনি কিছুই বুঝতে

পারার আগে পড়ে গেলেন একটা ঝোপের ওপরে। সে যেন তাঁকে আবার সরসরিয়ে টেনে নিয়ে গেল অনেকখানি।

কোনো জন্তু নয়, মানুষই, একজন কেউ দু' হাতে তাঁর গলা টিপে আছে। বিশু ঠাকুর প্রথম বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে চেষ্টা করলেন উল্টে গিয়ে আততায়ীকে আক্রমণ করবার।

লোকটি তখন বলল, "ঠাকুর, চুপ! শব্দ করো না!"

মাধবদাসের গলা! আনন্দে বিশু ঠাকুরের সারা শরীর কেঁপে উঠল। তিনি ভেবেছিলেন, এবার তাঁর নিশ্চিত মরণ হবে।

মাধবদাস ফিসফিসিয়ে বলল, "ঠাকুর, মরতে বসেছিলে! ঐ দ্যাখো, সামনের গাছের ডালে!"

বিশু ঠাকুর অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় চেয়ে দেখলেন, সামনে গাছের ডাল থেকে একটা কী যেন দুলছে! গাছেরই আর একটা ডাল মনে হয়, কিন্তু অন্য কোনো ডাল এমন দুলছে না।

মাধবদাস বলল, "সাপ! আর এক লহমা দেরি হলেই তোমায় কামড়াত!"

বিশু ঠাকুর উঠে এসে বললেন, "তুমি এলে কখন?"

"তোমায় একলা ছেড়ে দিয়ে মনটা কেমন লাগল! তাই পিছু পিছু চলে এলাম! এখানে ভীষণ সাপ!"

"আবার তুমি আমার প্রাণ বাঁচালে!"

"আমি বাঁচাইনি, ভগবান বাঁচিয়েছেন!"

"মাধবদাস, আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। বোম্বেটেরা সবাই এখন এখানে। এই সময় ওদের জাহাজে কেউ থাকে না। চলো, আমরা সমুদ্রে নেমে সাঁতরে, পেছন দিক দিয়ে ওদের একটা জাহাজে উঠি।"

"সাধ করে আমরা রাক্ষসের গুহায় পা দেব ?"

"জাহাজে কেউ থাকবে না। আমরা ভাল করে আগে দেখে নেব, যদি কেউ থাকে, আমরা আবার নেমে পড়ব জলে, এই অন্ধকারের মধ্যে আমাদের ওরা খুঁজে পাবে না। জাহাজ থেকে যদি চকমকি পাথর আর দু-একটা অস্ত্র পাওয়া যায়, তাতে তোমার সুবিধে হবে না ?"

"এই মোহনার মুখটায় কুমির গিসগিস করে। জাহাজে ওঠার আগেই যদি আমরা কুমিরের পেটে যাই ?"

"তোমার কপালে কী লেখা আছে, বাঘের পেটে যাওয়া, না কুমিরের পেটে যাওয়া ? তুমি তো ভীতু নও, মাধবদাস !"

"ঠাকুর, আমি না গেলে, তুমি একলাই নিশ্চয় যাবে ?"

"হ্যাঁ !"

"চলো তা হলে। মরতে হয় দু'জনেই একসঙ্গে মরি !"

গঞ্জালেসের জাহাজ আর আনাপুরামের জাহাজ পাশাপাশি রাখা। পেছন দিকে আনাপুরামের জাহাজ।

ওরা দু'জনে সাঁতরে এসে উল্টোদিক থেকে আনাপুরামের জাহাজের কাছে চলে এল। তারপর নোঙরের কাছি ধরে বিশ্রাম করতে লাগল একটু।

জাহাজের ডেকের ওপর একটা মাত্র লণ্ঠন জ্বলছে। তাতে একটু-খানি জায়গায় আলো হয়েছে। কোনো লোকজনের সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

বিশু ঠাকুর মাধবদাসকে খুব নিচু গলায় বললেন, "তুমি এখানে থাকো, আমি আগে দেখে আসি। আমার কোনো বিপদ হলে, তুমি চুপি চুপি পালিয়ে যেও !"

মাধবদাস বলল, "হুঁ!"

দড়ি বেয়ে বিশু ঠাকুর উঠে এলেন ওপরে। খুব সাবধানে রেলিঙের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারলেন। ডেকের ওপর কেউ নেই। তিনি রেলিং টপকে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলেন নিঃশব্দে। একটুক্ষণ পরে যখন বুঝতে পারলেন সত্যিই সেখানে কেউ পাহারা দিচ্ছে না, তখন তিনি একটা ছায়ামূর্তির মতন শাঁ করে দৌড়ে চলে এলেন ডেকের অন্য পাশে।

সেখানে পাশাপাশি দুটো ক্যাবিন। একটা ক্যাবিনের জানলার একপাশে দেখলেন, সেখানে একটা মিটমিটে আলো জ্বলছে আর খাটের ওপর শুয়ে আছে এক পরমাসুন্দরী মেয়ে। চক্ষু দুটি বোজা। যেন এক ঘুমন্ত রাজকুমারী।

সত্যিই ইনি আরাকানের রাজকুমারী এবং আনাপুরামের বোন সুবনা। কিন্তু তাঁর হাত দুটো খাটের সঙ্গে বাঁধা। খাটের নীচে দরজার সামনে বসে ঢুলছে একটি তেরো-চোদ্দ বছরের ফিরিঙ্গি বালক। এ গঞ্জালেসের নিজস্ব ভৃত্য, এর নাম ডোমিনিক। একে রেখে যাওয়া হয়েছে সুবনাকে পাহারা দেবার জন্য।

বিশু ঠাকুর সেখান থেকে সরে গিয়ে অন্য ক্যাবিনটাতে দেখলেন। সেটা ফাঁকা। তার পাশ দিয়ে তিনি জাহাজের খোলে নেমে যাবার একটা সিঁড়ি দেখতে পেয়ে নেমে গেলেন সেটা দিয়ে।

আনাপুরামের জাহাজ গঞ্জালেসের জাহাজের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর আর সাজানো-গোছানো। জাহাজের খোলের মধ্যে ক্রীতদাসদের রাখবার জন্য মস্ত বড় একটা ঘর, সেই ঘরের দেয়ালে সারি-সারি লোহার আংটা, ওগুলোতে ক্রীতদাসদের বেঁধে রাখা হয়। পাশাপাশি আরও দু-তিনটি ঘর রয়েছে।

কিন্তু কোথাও কোনো অস্ত্র খুঁজে পেলেন না বিশু ঠাকুর। আগের দিন লড়াইয়ের পর এ-জাহাজের সব অস্ত্র নিয়ে যাওয়া হয়েছে ও-জাহাজটাতে। এখানে কিছুই নেই।

ঘুরতে-ঘুরতে একটা ঘরে ঢুকে বিশু ঠাকুর বুঝলেন, সেটা এ জাহাজের রান্নাঘর। সেখানে তিনি পেলেন কয়েকটা চকমকি পাথর আর দু'খানা মাংস-কাটা ছুরি। তাড়াতাড়ি সেই পাথরগুলো কোমরে গুঁজে তিনি ছুরি দু'খানা সঙ্গে নিয়ে আবার পা টিপে-টিপে উঠে এলেন ওপরে। তারপর নোঙরের দড়ি বেয়ে ফিরে এলেন মাধবদাসের কাছে।

একখানা ছুরি আর চকমকি পাথরগুলো মাধবদাসকে দিয়ে তিনি বললেন, "এবার তুমি চলে যেতে পারো!"

মাধবদাস বলল, "আর তুমি কী করবে, ঠাকুর?"

"আমি তো শুধু জাহাজ থেকে জিনিস চুরি করতে আসিনি!"

"ঐ একখানা মাংস-কাটা ছুরি দিয়ে তুমি ডাকাতদের সঙ্গে লড়বে?"

"দেখা যাক, কী করা যায়?"

মাধবদাস নোঙরের দড়ি ধরে জাহাজের গায়ের দুটো আংটার ওপর দিব্যি বসে আছে। বিশু ঠাকুরও একটা আংটার ওপর পা দিয়ে দাঁড়ালেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা মাধবদাস, নদীর জলে হঠাৎ একটা কলকল শব্দ হচ্ছে কেন?"

মাধবদাস বলল, "ভাটার টান পড়েছে যে? দেখছ না, জল কমে যাচ্ছে। এই দ্যাখো, আগে এই পর্যন্ত জাহাজে জলের দাগ ছিল।"

"এই ভাটার টান কতক্ষণ থাকবে?"

"তা দু-তিন ঘন্টা !"

"এখন যদি আমরা ছুরি দিয়ে এই জাহাজের নোঙরের দড়ি কেটে দিই, তা হলে কী হবে ?"

"তাহলে ভাটার টানে জাহাজ গিয়ে সমুদ্দুরে পড়বে !"

"তারপর ?"

"পাল তো তোলাই আছে দেখছি ! তারপর বাতাস যেদিকে বইবে, জাহাজ সেইদিকে ছুটবে ! কেন, তুমি কি গোটা জাহাজটাই চুরি করতে চাও নাকি ?"

যখন ওরা এই সব কথাবার্তা বলছে, তখন নদীর ধারে গম্বুজের পাশে আবার অন্য একটা ব্যাপার চলছে।

গঞ্জালেসের সঙ্গে তার কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরের রীতিমতন ঝগড়া বেধে গেছে। সুন্দরবনের এই জায়গাটা ছেড়ে চট্টগ্রামের দিকে রওনা হয়েও তারা আবার কেন এখানে ফিরে এল, তা প্রথমে তারা কেউ বুঝতে পারেনি ! তাদের সঙ্গে এখন প্রচুর লুটের মাল। বিশেষত আনাপুরাম আর তার দলবলকে হত্যা করে তারা এত সম্পদ পেয়েছে, যা তারা কখনো স্বপ্নেও ভাবেনি ! এখন তারা চায় বাড়ি ফিরে গিয়ে কিছুদিন ফুর্তি করতে। এই রকমই হয় প্রতি বছর। কিন্তু তাদের কাপ্তান তাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ?

আনাপুরামের বোন সুবনার কাছে ডোমিনিক নামে যে ছোকরা চাকরটি থাকে, সে সুবনার কাছ থেকে শুনেছে যে, চট্টগ্রাম মোগলদের দখলে চলে গেছে, আর সন্দীপও মোগলরা নিয়ে নেবে। তারা আর সেখানে ফিরতে পারবে না।

ডোমিনিক এই খবর দিয়ে দিয়েছে অন্য দস্যুদের কাছে। তাই তারা চঞ্চল হয়ে উঠেছে খুব। গঞ্জালেস তার স্ত্রী-পুত্রদের ওপর সব

দয়ামায়া ত্যাগ করে তাদের ফেলে পালাতে চায়, কিন্তু সব দস্যু তা চায় না। তাদের ইচ্ছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সন্দ্বীপে ফিরে যাবে, সেখানে যদি মোগলরা আগেই পৌঁছে থাকে, তবে তাদের সঙ্গে লড়াই করে তারা বীরের মতন প্রাণ দেবে। তবে, তাদের এখনো ধারণা, জলযুদ্ধে মোগলরা তাদের সঙ্গে পারবে না।

গঞ্জালেস অনেকভাবে তাদের বোঝাবার চেষ্টা করছে। গঞ্জালেসের অভিজ্ঞতা অনেক বেশি। সে শায়েস্তা খাঁর নাম আগে থেকেই জানে। মোগল সম্রাট যখন অতবড় একজন সেনাপতিকে পাঠিয়েছেন, তখন ভালমতন ব্যবস্থাও করেছেন নিশ্চয়ই। এতবড় একটা দেশের রাজশক্তির সঙ্গে লড়াই করে জলদস্যুরা কখনো জিততে পারে না। এই রকম সময়ে জলদস্যুদের লুকিয়ে থাকাই নিয়ম। কোনোরকমে একবার গোয়ায় পৌঁছতে পারলে হয়। তার পর পর্তুগীজ সৈন্যদের সাহায্য নিয়ে আবার চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপ উদ্ধার করতে হবে।

গঞ্জালেসের পরেই যে দস্যুদলের মধ্যে প্রধান, তার নাম আন্তোনিও। গঞ্জালেস যেমন বিশাল মোটা, সে তেমনি খুব লম্বা। এই আন্তোনিওই ঝগড়া করছে বেশি, সে এক্ষুনি সন্দ্বীপের দিকে রওনা হতে চায়। অনেক জলদস্যুই আন্তোনিওর পক্ষে।

খুব যখন কথা-কাটাকাটি চলছে, তখন হঠাৎ একজন বোম্বেটে চেঁচিয়ে উঠল, "ওহ্ গড! আমার কী হল? আমি মরে গেলাম।"

সে মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল, আর সবাই দেখল তার পাশে ফণা তুলে ফোঁস ফোঁস করছে মস্ত বড় একটা সাপ।

সাপ দেখে সবাই প্রথমে হুড়োহুড়ি করে দৌড়ে পালিয়ে গেল। একমাত্র সাহসী গঞ্জালেস কোমরের খাপ থেকে তলোয়ার টেনে

এক কোপে কেটে ফেলল সাপটাকে।

ঠিক তক্ষুনি ক্রীতদাসদের মধ্য থেকে একজন আবার চেঁচিয়ে উঠল, "বাপরে! মা রে! সাপ! আমায় সাপে কামড়েছে।"

সে লোকটাও ঢলে পড়ে গেল মাটিতে।

তখন মশালের আলোয় দেখা গেল, সেখানে কিলবিল করছে আরও চার-পাঁচটি সাপ। জোয়ারের সময় জল উঠে এলে এই সাপগুলো গাছের ওপর আশ্রয় নেয়। আবার ভাটার সময় নেমে আসে। দস্যুদের মনে হল, হঠাৎ যেন কোনো সাপের বাহিনী তাদের আক্রমণ করতে আসছে।

ভয়ঙ্কর-ভয়ঙ্কর দস্যুরাও সাপকে ভয় পায়। সাপ যে কখন কোনদিক দিয়ে কামড়াবে, তার কোনো ঠিক নেই। তারা কেউ আর সেখানে থাকতে চায় না এক মুহূর্ত। যাতে কোনো রকম বিশৃঙ্খলা না হয়, সেই জন্য গঞ্জালেস হুকুম দিল, আগে সব ক্রীতদাসদের জাহাজে তোলা হোক, তারপর অন্যরা উঠবে।

যে-ক্রীতদাসটিকে সাপে কামড়েছিল, তাকে সেখানেই ফেলে গেল ওরা। আর ফিরিঙ্গিটিকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে চলল। কিন্তু জাহাজে ওঠার কিছুক্ষণ পরেই মারা গেল সে-ও।

গঞ্জালেস বলল, "কাল দিনের বেলা আমরা কিছু হরিণ আর শুয়োর শিকার করে আনব। আর জলের জালাগুলোতে ভরে নেব নদীর জল। তারপর জাহাজ আবার চলবে। আমাদের সঙ্গে যা ধনসম্পদ আছে, তাতে প্রত্যেকেই আমরা গোয়াতে গিয়ে রাজার হালে থাকতে পারব!"

আন্তোনিও সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে বলল, "নাঃ! আমরা গোয়া যাব না! আমরা সন্দ্বীপ যাব!"

অন্য অনেক দস্যু সেই কথার প্রতিধ্বনি করে বলল, "হ্যাঁ, আমরা সন্দ্বীপ যাব। আমাদের বাড়ির লোকজনদের কী হল, জানতে চাই।"

রাগে জ্বলে উঠল গঞ্জালেসের চোখ। সে গর্জন করে উঠল, "কী, আমার মুখের ওপর কথা। আমি কাপ্তান, আমার মুখের প্রতিটি কথাই আদেশ! আটজন প্রহরী থাকবে, বাকি সবাই শুতে যাও এখন!"

আন্তোনিও বলল, "না, কাপ্তান। আপনার অন্যায় আদেশ আমরা মানব না। আমরা এখন বাড়ি যেতে চাই। আজ রাতেই।"

কয়েকজন দস্যু তলোয়ার উঁচিয়ে বলল, "আমরা কাপ্তানের আদেশ মানি না!"

গঞ্জালেস ধমক দিয়ে উঠল, "তলোয়ার নামাও গর্দভের দল। নইলে এখুনি তোদের শেষ করব!"

অমনি জাহাজের ডেকের ওপর যুদ্ধ লেগে গেল! কিছু দস্যু গঞ্জালেসের যে-কোনো কথায় প্রাণ দিতে পারে, তারাও তলোয়ার খুলে ঝাঁপিয়ে পড়ল আন্তোনিওর দলের ওপর।

আন্তোনিও একটা লম্বা তলোয়ার নিয়ে ছুটে এল গঞ্জালেসের দিকে।

গঞ্জালেস কিন্তু তলোয়ার বার করল না, স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে থেকে হুকুমের সুরে বলল, "নির্বোধ আন্তোনিও, এখনো বলছি, তলোয়ার ফেলে দে, তাহলে তোকে ক্ষমা করব!"

আন্তোনিও কাছে এসে বলল, "লড়ো আমার সঙ্গে! কাপুরুষ! তুমি লড়তে ভয় পাও! মোগলের সঙ্গে লড়াইয়ের ভয়ে তুমি পালাচ্ছ?"

গঞ্জালেস আর দ্বিধা না করে পিস্তল হাতে নিয়ে সোজা গুলি করল আন্তোনিওর বুকে! আন্তোনিওর চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে, সেই অবস্থায় সে ঘুরে পড়ে গেল ধপাস করে!

পিস্তলের শব্দে যুদ্ধ থেমে গিয়েছিল এক মুহূর্তের জন্য। আবার শুরু হয়ে গেল। অন্য দস্যুরাও জানে, একবার বিদ্রোহ করলে আর ক্ষমা নেই, এখন জিততে না পারলে গঞ্জালেসের বিশ্বাসী দস্যুদের হাতে সবাইকে মরতে হবে। পিস্তলে একবার গুলি ছোঁড়া হলে আর একবার গুলি ভরতে একটু সময় লাগে। সেইজন্য এক সঙ্গে দশ-বারো জন দস্যু ধেয়ে এল গঞ্জালেসের দিকে।

এবার গঞ্জালেস তলোয়ার ধরল। তার সঙ্গে যুদ্ধে পারার ক্ষমতা এ-জাহাজে কারুর নেই। তার দলেও বেশ কিছু দস্যু আছে। লড়াই জমে উঠল খুব। মাঝে-মাঝেই এক একজন দস্যু পড়ে যেতে লাগল মাটিতে।

লড়তে-লড়তে এগিয়ে এসে গঞ্জালেস নিচু হয়ে মৃত আন্তোনিওর কোমর থেকে আর একটা পিস্তল টেনে নিল। এ-জাহাজে শুধু গঞ্জালেস আর আন্তোনিওর কাছেই দুটি পিস্তল ছিল। আন্তোনিও নিজের পিস্তল বার করেনি। কারণ সে ভেবেছিল, তার কাপ্তান তার সঙ্গে বীরের মতন লড়াই করবে। খুনোখুনি না করে শুধু লড়াইয়ের পর হার-জিত মেনে নেবে দু' পক্ষ। তার কাপ্তান যে খুন করে ফেলবে, সে কল্পনাই করেনি। তার মৃত চোখ দুটিতে সেই বিস্ময় এখনো লেগে আছে।

কাপ্তানের হাতে আর-একটি পিস্তল দেখে বিদ্রোহী দস্যুরা এবার ভয় পেয়ে গেল। তারা যুদ্ধ থামিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে বলল, "কাপ্তান, আমাদের ক্ষমা করো!"

পিস্তল উঁচিয়ে রেখে, গঞ্জালেস বিদ্রোহীদের উদ্দেশে বলল, "সবাই অস্ত্র ফেলে দে!"

বিদ্রোহীরা তাই করল।

গঞ্জালেস তার অন্য অনুচরদের বলল, "দড়ি দিয়ে হাত-পা বাঁধ সব ক'টার।"

ডেকের ওপরেই জড়ো করা ছিল দড়ির স্তূপ। গঞ্জালেসের অনুচরেরা বিদ্রোহী দস্যুদের সকলের হাত-পা বেঁধে ফেলল চটপট করে।

গঞ্জালেস জ্বলন্ত চক্ষে বলল, "বিদ্রোহীদের একমাত্র শাস্তি মৃত্যু। কিন্তু আমার মন বড় নরম, নিজের লোকদের আমি সহজে মারতে চাই না! কাল বিকেলে জাহাজ ছাড়ার পর যে-যে এসে আমার পা ধরে ক্ষমা চাইবে, আমি তাদের দোষ ক্ষমা করব!"

অনেক বিদ্রোহী বলে উঠল, "কাপ্তান, আমরা এখুনি ক্ষমা চাইছি। আমরা তোমার পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইছি!"

গঞ্জালেস বলল, "আজ রাত্রে সবাই বন্দী থাকবে! এখন ছেড়ে দিলে আবার এক সময় হাঙ্গামা বাধাবি তোরা!"

গঞ্জালেসের নির্দেশে সব ক'জন বিদ্রোহীকে সেই রকম হাত-পা-বাঁধা অবস্থায় রেখে দেওয়া হল এক জায়গায়। গঞ্জালেসের নিজের দলে রইল মাত্র কুড়ি-পঁচিশ জন। প্রায় পনের-ষোলজন দস্যু মৃত বা সাঙ্ঘাতিক আহত অবস্থায় পড়ে রইল ডেকের ওপর।

গঞ্জালেস নিজস্ব অনুচরদের নিয়ে এগোল ভাঁড়ার-ঘরের দিকে। কোনো একটা যুদ্ধের পরই বুলেপঞ্জ পান না করলে দস্যুরা ঠিক থাকতে পারে না। নিজেদের মধ্যে লড়াই করে তারা আরও বেশি অবসন্ন। গলগল করে তারা বুলেপঞ্জ ঢেলে দিতে লাগল গলায়।

জাহাজের খোলের মধ্যে বন্দীরা ওপরের দাপাদাপি আর তলোয়ারের ঝনঝনানি আর পিস্তলের গুলির শব্দ শুনতে পেয়েছে, কিন্তু কী যে হচ্ছে তা কিছুই বুঝতে পারল না!

একটু পরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল একটি ছায়ামূর্তি। বন্দীদের কাছে গিয়ে ডাকল, "নিতাই! নিতাই!"

নিতাই দারুণ ভয় পেয়ে বলে উঠল, "কে?"

"চুপ! আমি বিশু ঠাকুর!"

প্রায় সব বন্দীই একসঙ্গে ভয়ের শব্দ করে উঠল। নিতাই দম-চাপা গলায় বলল, "ঠাকুর, তুমি ভূত হয়ে এসেছ? তোমায় তো মেরে ফেলেছে শুনেছি!"

বিশু ঠাকুর বললেন, "না, আমি মরিনি! কেউ কোনো শব্দ কোরো না! আমি যা বলছি, শুধু শুনে যাও! আমি তোমাদের হাত-পায়ের বাঁধন খুলে দেব। তোমাদের বাঁচার একটা উপায় পাওয়া গেছে। কিন্তু তার জন্য সাহসী হতে হবে। এখানে প্রায় দেড়শো জন মেয়ে-পুরুষ আছে, তার মধ্যে প্রায় সত্তর আশিজন শক্ত, সমর্থ জোয়ান। তোমাদের একটা কাজ করতে হবে।"

দূরের এক কোণ থেকে কুড়ানি বলে উঠল, "ঠাকুর, তুমি সত্যিই বেঁচে আছ? একবার কাছে এসো তো, ছুঁয়ে দেখি!"

বিশু ঠাকুর সেদিকে এগিয়ে গিয়ে কুড়ানির বাঁধন খুলে দিলেন। তারপর অন্যদেরও বাঁধন একে-একে খুলতে খুলতে বললেন, "তোমরা সবাই তৈরি হয়ে থাকবে। জাহাজ এক সময় দুলে উঠবে। থেমে থাকা জাহাজ চলার সময় যেমন দুলে ওঠে সেই রকম। ঠিক তক্ষুনি জোয়ান পুরুষরা সবাই ওপরে উঠে যাবে! ডাকাতরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে অনেকে মরেছে, অনেকে বন্দী হয়ে আছে। ওপরে

পাহারায় থাকবে মাত্র সাত-আট জন। তোমরা একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বে তাদের ওপর। পারবে না?"

কে একজন বলল, "ওরে বাবা, তাদের হাতে যে বড় বড় সব তলোয়ার। কচুকাটা করবে আমাদের!"

বিশু ঠাকুর বলল, "ওপরে উঠে দেখবে যে-সব দস্যু মরে পড়ে আছে, হাতের তলোয়ারও পড়ে আছে তাদের পাশেই। আজ রাতে আর ওসব কেউ সরাবে না। ঐগুলো তোমরা হাতে তুলে নেবে! কী রে নিতাই, পারবি না?"

নিতাই বলল, "কিন্তু, ঠাকুর, আমরা কেউ তলোয়ার চালাতে জানি না। বোম্বেটেদের সঙ্গে আমরা কী করে পারব?"

বিশু ঠাকুর বললেন, "আজ রাতে কেউ আর ভাল করে পাহারা দেবে না। ওরা নেশায় মাতাল হয়ে আছে। পারতেই হবে, তোমাদের যে-কোনোভাবে হোক, পারতেই হবে! আজ রাতেই শেষ সুযোগ। নইলে তোমাদের নিয়ে যাবে অনেক দূরদেশে। কুকুর-বেড়ালের মতন বেঁচে থেকে লাভ কী? লড়াই করে বাঁচার শেষ চেষ্টা করবে না?"

কালু শেখ বলল, "হ্যাঁ ঠাকুর, লড়ব। তুমি বলছ যখন!"

নিতাই বলল, "কিন্তু ঐ ষাঁড়ের মতন চেহারার কাপ্তান? সে একাই তো একশো!"

বিশু ঠাকুর বললেন, "কাপ্তানের সঙ্গে লড়াইয়ের ভার রইল আমার ওপর। তোমাদের সবাইকে লড়তে হবে এককাট্টা হয়ে। ওপরে উঠে হাতের কাছে তলোয়ার, বর্শা, ডাণ্ডা যা পাবে তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। মনে থাকে যেন, জাহাজ যখন নড়ে উঠবে!"

আরও কয়েকটা নির্দেশ দিয়ে বিশু ঠাকুর উঠে গেলেন ওপরে।

বন্দীদের কয়েকজনের হাত-পায়ের বাঁধন তিনি খুলে দিয়েছেন, এবার ওরাই বাকিদের খুলে দেবে।

রাত আর একটু ঘন হলে গঞ্জালেস হেঁড়ে গলায় গান গাইতে গাইতে চলে এল আনাপুরামের জাহাজে। তার নিজের দলের লোকেরা বিদ্রোহ করেছিল, তাদের কয়েকজনকে মেরে ফেলতে হয়েছে, আর কয়েকজনকে বন্দী করতে হয়েছে বলে তার মন খুব ভারাক্রান্ত। সেটা চাপা দেবার জন্যই সে খুব কষে বুলেপঞ্জ খেয়েছে, আর গান গাইছে!

যে ক্যাবিনে সুবনা শুয়ে আছে, সেই ক্যাবিনে প্রথমে এসে ঢুকল গঞ্জালেস। ডোমিনিক নামের ছেলেটি তাকে দেখে উঠে বসতেই গঞ্জালেস খুব জোর এক লাথি কষাল তাকে। দাঁত কড়মড় করে বলল, "শয়তানের বাচ্চা, তুই সব খবর দিয়েছিলি আন্তোনিওকে! ভাল করে পাহারা দে!"

সুবনা চোখ বড় বড় করে চেয়ে আছে দেখে গঞ্জালেস বলল, "গোয়ায় নিয়ে গিয়ে আগে তোমায় খ্রীষ্টান করব, তারপর বিয়ে করব তোমায়। তারপর দেখব, তোমার কত তেজ!"

আবার হেঁড়ে গলায় গান গাইতে গাইতে গঞ্জালেস সেখান থেকে বেরিয়ে চলে এল পাশের ক্যাবিনে। ধপাস করে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

একটু পরেই জাহাজটা দুলে উঠল বেশ জোরে।

গঞ্জালেসের তন্দ্রা-মতন এসেছিল, তবু জাহাজের দুলুনি সে ঠিক টের পেল। বিছানায় উঠে বসে সে বলল, "এ কী?"

সঙ্গে-সঙ্গে তীরের মতন এক ছায়ামূর্তি ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল তার ওপর। তার হাতে একটা ছুরি। সেটা বসিয়ে দিতে গেল

গঞ্জালেসের বুকে। কিন্তু গঞ্জালেসের বুকে, কোটের তলায় একটা লোহার পাত বাঁধা থাকে। ছুরি তার বুকে লাগল না। তখন সেই ছায়ামূর্তি তার বুকের ওপর বসে পড়ে প্রাণপণে টিপে ধরল গলা।

একটুক্ষণের জন্য গঞ্জালেস বেকায়দায় পড়েছিল। কিন্তু তার গায়ে অসুরের শক্তি। সেও প্রচণ্ড এক ঠ্যালা লাগাল আততায়ীকে। বিশু ঠাকুর ছিটকে পড়ে গেলেন দরজার বাইরে। পরক্ষণেই তিনি আবার উঠে দাঁড়ালেন।

কিন্তু তিনি আবার আসবার আগেই বিছানায় বসে থাকা অবস্থাতেই গঞ্জালেস পিস্তলের গুলি চালাল। বিশু ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেলেন দড়াম করে।

গঞ্জালেস বিছানা থেকে নেমে এল বাইরে। পা দিয়ে বিশু ঠাকুরের শরীরটা উল্টে দিয়ে বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, "এটা সেই ভূতটা ? এ মরেনি ?"

বিশু ঠাকুর তখনও মরেননি। তাঁর বাঁ কাঁধে গুলি লেগেছে, তবু সেই অবস্থাতেও মরিয়া হয়ে তিনি আচমকা গঞ্জালেসের পা ধরে এক টান মারলেন! গঞ্জালেসও পড়ে গেল ডেকের ওপর।

বিশু ঠাকুরই আগে উঠে দাঁড়ালেন। গঞ্জালেসও উঠে বসে হিংস্র গলায় হিসহিসিয়ে বলল, "বাঙালী কুকুর! এবার তোর গলা টিপে আমি শেষ করব!"

কিন্তু গঞ্জালেসকে আর উঠতে হল না। আর একটি ছায়ামূর্তি পেছন থেকে এসে গঞ্জালেসের মাথায় লোহার ডাণ্ডা দিয়ে এক ঘা কষাল। গঞ্জালেস গড়িয়ে পড়ল অজ্ঞান হয়ে!

ঠিক তখনই গোলমাল শুরু হল পাশের জাহাজে। বিশু ঠাকুর বললেন, "তুমি ঠিক সময়ে এসে পড়েছ মাধবদাস! নইলে আমি আর

পারতুম না। তুমি শক্ত দড়ি দিয়ে একে বেঁধে ফেল। দেখো, খুব সাবধান! আমি যাই পাশের জাহাজে!"

পাশের জাহাজ দখল করতে মোটেই বেগ পেতে হল না। এ জাহাজের অধিকাংশ জলদস্যুই নেশায় একেবারে অজ্ঞান হয়ে ছিল। আজ রাতে আর কোনোরকম ঝঞ্ঝাট তারা আশঙ্কাই করেনি। ক্রীতদাসরা সবাই মিলে ঘিরে ধরায় তারা লড়বার সামান্য চেষ্টা করল, কিন্তু হাত ঠিকমতন চলছে না। এর মধ্যে বিশু ঠাকুর গঞ্জালেসের পিস্তলটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে দস্যুদের বললেন, "তোমরা আত্মসমর্পণ করলে সবাই বেঁচে যাবে। তোমাদের কাপ্তান গঞ্জালেস ধরা পড়েছে। আর তোমাদের আশা নেই!"

বিশু ঠাকুরকে দেখে ভয়ে তাদের গলা শুকিয়ে গেল। তারা অস্ত্র ফেলে দিল মাটিতে।

জাহাজ দুটো ততক্ষণে সমুদ্রে এসে পড়ছে। পূব দিকের বাতাস পালে লেগে জাহাজ দুটো ছুটল সেই দিকে। দস্যুদের সবাইকে বেঁধে ফেলার পর নিতাইয়ের দল মাধবদাসের নির্দেশে দাঁড় বাইতে শুরু করল।

পুরো একদিন সমান গতিতে চলার পর জাহাজ দুটি এসে পৌঁছল চট্টগ্রামে। বিশু ঠাকুরের গায়ে যে গুলি লেগেছিল, তাতে বেশি ক্ষত হয়নি, তিনি শায়েস্তা খাঁর শিবিরে গিয়ে খুলে বললেন সব কথা।

আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে শায়েস্তা খাঁ দলবল নিয়ে দেখতে এলেন জাহাজে বন্দী জলদস্যুদের। সর্দার গঞ্জালেসের নাম তিনিও শুনেছেন। বঙ্গোপসাগরের জলদস্যুদের মধ্যে এই গঞ্জালেসই সবচেয়ে কুখ্যাত। সেই গঞ্জালেস যে এমন বন্দী অবস্থায় জাহাজের

ভেকে পড়ে আছে, এ দেখে বিস্ময়ে শায়েস্তা খাঁর চোখ কপালে উঠল।

শায়েস্তা খাঁ গঞ্জালেসকে বললেন, "তোমার সাহস আর বীরত্বের কথা আমি শুনেছি। তুমি বহু পাপ করেছ, বহু লোককে খুন করেছ, তবু আমি তোমাকে এবং তোমার দলবলকে একটা সুযোগ দিতে চাই। আরাকান অভিযানে তোমরা যদি আমাদের সাহায্য কর, তাহলে আমি মোগল-সম্রাটের নামে ক্ষমা করব তোমাদের। নৌ-যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য আমাদের কাজে লাগবে।"

গঞ্জালেসের বাঁধন খুলে দেওয়া হলে সে শায়েস্তা খাঁর সামনে এক হাঁটু গেড়ে বসে বলল, "সন্দ্বীপে আমাদের সকলের বৌ-ছেলেমেয়েদের যদি আপনি ফিরিয়ে দেন, তাহলে আমরা সবাই আপনার আনুগত্য মেনে নেব।"

শায়েস্তা খাঁ বললেন, "তাই হবে।"

তারপর তিনি বিশু ঠাকুরের খুব প্রশংসা করার পর জিজ্ঞেস করলেন, "ব্রাহ্মণ, বলো, তুমি কী পুরস্কার চাও? সোনাদানা, জায়গির, মনসবদারি পদ, যা তোমার খুশি চাও।"

বিশু ঠাকুর বললেন, "আমার কিছুই চাই না। শুধু আমার একটা শপথ মিটিয়ে নিতে দিন।"

জাহাজের ডেক থেকে একটা চাবুক কুড়িয়ে নিয়ে তিনি শপাং শপাং করে দু-ঘা চাবুক কষালেন গঞ্জালেসের গায়ে। তারপর চাবুক ফেলে দিয়ে কাছে এসে গঞ্জালেসের দু-গালে লাগালেন দুটি প্রচণ্ড থাপ্পড়!

শায়েস্তা খাঁর দিকে ফিরে বিশু ঠাকুর বললেন, "সেনাপতি, এই আমার পুরস্কার। আমি এইটুকুই চেয়েছিলাম।"

ইতিহাসে বলে দুর্ধর্ষ ফিরিঙ্গি জলদস্যু সিবাস্তিয়ান গঞ্জালেস টিবাও কয়েকটি শর্তে তার দলবল নিয়ে ধরা দিয়েছিল মোগল সেনাপতি শায়েস্তা খাঁর কাছে। কিন্তু বিশু ঠাকুর নামে একজন বাঙালী যুবক যে তাদের কৌশলে ধরে এনে শায়েস্তা খাঁর হাতে তুলে দিয়েছিল, সে-কথা লিখতে ঐতিহাসিকরা ভুলে গেছেন। ইতিহাস শুধু রাজা-রাজড়াদের কথাই লেখে, সাধারণ মানুষের বীরত্বের কথা মনে রাখে না।···

এর পরেও একটা ছোট্ট ঘটনা আছে। সেটা ঠিক ইতিহাসের মতো নয়, ঠিক যেন গল্পের মতন। কিন্তু এমন অনেক সত্যি ঘটনা ঘটে, যা গল্পের চেয়েও বিস্ময়কর!

যারা ক্রীতদাস-দাসী হবার জন্য বন্দী হয়েছিল, তারা সবাই এখন মুক্ত। জাহাজ ছেড়ে যখন তারা মাটিতে নামছে, তখন মুখভর্তি চুলদাড়িওয়ালা একজন লোক হঠাৎ একটি মেয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, "লক্ষ্মীরানী! ওরে, তুই আমার লক্ষ্মীরানী না?"

মেয়েটি হচ্ছে কুড়ানি। সে ভাবাচাকা খেয়ে গেল। এ-রকম একটা পাগলা-মতন লোককে হঠাৎ জড়িয়ে ধরতে দেখলে ভয় পাবারই কথা!

লোকটি আবার বলল, "ওরে, তুই আমায় চিনতে পারছিস না? তুই জলে ভেসে গিয়েছিলি, নৌকো উল্টে গেল, ওরে আমি যে তোর বাবা, মাধবদাস!"

তখন কুড়ানিও বলে উঠল, "বাবা!"

তারপর কুড়ানি আর মাধবদাস দু'জনেই কাঁদতে লাগল। এই কান্না কিন্তু আনন্দের।